দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖১৪ সংখ্যা ❖২ ডিসেম্বর ২০২৫

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

আন্তর্জাতিক

● সাজানো বিচারে শেখ হাসিনার প্রাণদণ্ডাদেশ	অমিতাভ সিংহ	২
● বাংলাদেশে বাউল আবুল সরকারকে গ্রেফতার	জাকির তালুকদার	৩

সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

● ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত		৪

প্রবন্ধ

● লালন ফকিরের উপর সুফিবাদের প্রভাব	তানভীর মোকাম্মেল	৫
● ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস	মধুশ্রী বন্দোপাধ্যায়	৮
● ভারতের সংবিধান সম্পর্কে কিছু সাধারণ কথা	মজিবুর রহমান	৯
● বাংলাদেশে বাউল ও ফকিরদের ওপর আক্রমণ	শুভ বসু	১০

পরিবেশ ভাবনা

● প্রযুক্তি, জনসংখ্যা ও পরিবেশ	সিদ্ধার্থ সেন	১২
● জলবায়ু সম্মেলন-৩০	রাহুল রায়	১৪

নির্বাচন

● বিহারে নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা	সৌর বসু	১৯
● বিহার নির্বাচন ও অন্য রাজ্য	সায়ক ঘোষ চৌধুরী	২১

দেশের খবর

● গিলোটিনে কি এবার আই.এস.আই	মনিরুল হক	২২
● চারটি শ্রমকোড কেন বাতিল	কুশল দেবনাথ	২৪
● কেন্দ্রের ৮.২ % আর্থিক বৃদ্ধির দাবি	অমিতাভ সিনহা	২৯
● কারখানার বরাতে বিজেপিকে টাটার দান	শুভ মিত্র	৩০
● মসজিদ, ভোট ও শিক্ষার তর্ক	জজবুল সেখ	৩১

ধারাবাহিক

● স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস-এর ভূমিকা	শান্তনু দত্ত চৌধুরী	৩২
● জরুরি অবস্থা ও দক্ষিণপন্থী শক্তি	সুশান্ত দাসগুপ্ত	৩৫

ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত

➲ সম্পাদকীয়

সংবিধানের আলোকে এস.আই.আর

১৯৫১-৫২সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন দেশের শতকরা ১০ ভাগ লোক স্বাক্ষর ছিল। এই দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা? পাশ্চাত্যের ধনবাদী দুনিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেছিল। আরএসএস- এর মুখপত্র Organiser এই সময় লেখে 'শোনা যায় নেহরুকে নিরক্ষর জনসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে সংসদীয় ব্যবস্থার এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ঝাঁপ দিতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নাকি বারণ করেছিলেন। এমন কী গান্ধিজিও নাকি এই ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু নেহরু তাঁদের কথা শুনবেন কেনো? সারাটা জীবন তো তাঁর চমক দিয়ে আর ভাওতাবাজি করে কেটেছে।'

এই ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আর.এস.এস এর মনোভাব। তবে এদের এই মিথ্যা প্রচারে স্বাধীন ভারত বিভ্রান্ত হয়নি। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় আমাদের চিফ ইলেকশন কমিশনার ছিলেন সুকুমার সেন। এই ICS অফিসার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনি। তাঁর লক্ষ ছিল প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী যেনো ভোটার হয় ও ভোট দান করে। প্রথম সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর দেশের মানুষ বললো জিতেছে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুকুমার সেন। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের দেশীয় অণুচররা খুবই বেকুব বনে গেলেন। পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দান করতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। আর বললেন ' তাঁরা অত্যন্ত বিবেচনা করে ভোট দিয়ে অনেক যোগ্য বিরোধী প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছেন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আমাদের সহযোদ্ধা ছিলেন। 'এই ছিল আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' আর আজ ? চেষ্টা হচ্ছে কত প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের ভোটদান -এর অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। ১৯৫১ সাল থেকে এই পর্যন্ত আট বার ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (Intensive Revision)হয়েছে। সেই নিবিড় সংশোধন অন্তত দুই বছর সময় নিয়ে করা হয়েছে। এবার যে Special I.R করা হচ্ছে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে ইলেকশন কমিশন- এর কোনও বিশেষ জরুরি অবস্থায় যথা বন্যা বা যুদ্ধ'র মতো পরিস্থিতিতে Special I.R করার অধিকার আছে, তাও একটি/ দুটি কেন্দ্রে। কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে এই SIR করার অধিকার EC 'র নেই। I.R এর উদ্দেশ্য ছিল একটি ত্রুটি মুক্ত ভোটার.তালিকা প্রস্তুত করা। অর্থাৎ তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া। দু জায়গায় নাম থাকলে তা Delete করা। কিন্তু এবার ইলেকশন কমিশন যা করছেন তা অস্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলেছেন ঘুষপেটিয়া অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারি চিহ্নিত করার জন্য এই SIR. কিন্তু এতো প্রচার সত্বেও বিহারে কোনও বাংলাদেশী পাওয়া যায়নি তা নির্বাচন কমিশন স্বীকার করেছে। বাদ গিয়েছে সংখ্যালঘু , দলিত যাদের মধ্যে রয়েছেন বিরাট সংখ্যক মহিলা। এর পর বলা হবে এরা নাগরিক নয়। এই রাজ্যে দের কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারি ও রোহিঙ্গা আছে বলে রাজ্যের বিজেপি নেতারা অনেক দিন ধরে বলে চলেছেন' তাদের লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আগত মতুয়া , নমশুদ্র ও অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের কী হবে ? কেরালা, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশে কি অনুপ্রবেশ খোঁজ করবেন কমিশন? ২০০২ সালের পর যারা ৮ বার ভোট দিয়েছেন তাঁরাও অধীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মা বাবার নাম খোঁজার জন্যে। ভোটার হতে গেলে গোটা দেশের মানুষকে রাস্তায় নামতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহক এই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে। কেন্দ্রীয় সরকার কি NRC করতে চাইছেন?

নাৎসি নায়ক হিটলার বলেছিলেন দেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে দেশের মানুষ মনে করতে বাধ্য হয় যে তাদের বেঁচে থাকাটাই সরকারের বিরাট বদান্যতা। অন্য কোনও দাবি করতেই তারা সাহস পাবেনা। এই দেশেও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ই-মেল- nagorik.co.in

আন্তর্জাতিক

সাজানো বিচারে বাংলাদেশের জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণদণ্ডাদেশ

অমিতাভ সিংহ

গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়দানের খবর অপ্রত্যাশিত ছিল না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল-১ এর প্রায় ঘন্টা তিনেকের ৪৫৩ পৃষ্ঠার বিরক্তিকর রায়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল হাসিনাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর ।একইসঙ্গে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের মৃত্যুদণ্ড ও একই অপরাধে (?) দুষ্ট প্রাক্তন পুলিশকর্তা আল মামুনের মাত্র পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। কারণ রাজসাক্ষী হয়ে শেখ হাসিনার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়ার সাক্ষী হওয়ার জন্য। এসবই ঘটেছে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন জামায়েতে ইসলামী, এনসিপি, বিএনপি সহ ইউনূস সরকারের ইচ্ছায়। রায় ঘোষিত হওয়ার পর ইউনূস সরকার বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলির জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে যাতে তারা শেখ হাসিনার কোনও বক্তব্য প্রচার না করতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। আওয়ামী লীগের ডাকা বনধ বা শাটডাউনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা দোকানপাট ছিল পুরোপুরি বন্ধ। ইউনূস সরকার মুখে যতই কড়া হাতে তা সামলানোর কথা বলুক না কেন,তাদের যে সেই ক্ষমতা নেই তা প্রমাণিত। কয়েক হাজার আওয়ামী লিগ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। হাসিনাকে সমর্থনের জন্য ৬৫৯ জন শিক্ষকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার দাবী জানিয়েছে উক্ত দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের নেতৃত্ব যারা জামাত সমর্থক ছাত্র শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। শেখ হাসিনা এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ বা নিজের পছন্দমত আইনজীবী নিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। একথা সর্বাংশে যে সত্য তা সরকারের তরফে নিয়োগ করা আইনজীবী মহঃ আমির হোসেনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। তিনি যে শেখ হাসিনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেননি ও তার কোন সুযোগও পাননি তা স্পষ্টভাবেই তিনি বলেছেন। মজার কথা হল এটা যে আমির হোসেনের আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতাই নেই। ফলে কিরকম বিচার হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই ট্রাইব্যুনাল এর চরিত্রটি একটু দেখে নেওয়া যাক। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি- বি) গঠিত হয় ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের ওপর ভিত্তি করে, যা ২০০৮ সালে সংশোধন করা হয়।এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার বিচার করা। ২০২৪ এর জুলাই কান্ডের পর তা আবার সংশোধন করা হয় অধ্যাদেশ জারি করে যা সম্পূর্ণ বেআইনি। সেসময় আইনসভা ছিল অচল,কোন আইনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেই।বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী সে দেশের রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারে না।

বিচারপতি নিয়েও বেশ গণ্ডগোল রয়েছে। ১০ অগস্ট ২০২৪ এ বিদ্রোহী ছাত্ররা গায়ের জোরে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ আরও পাঁচজন বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। বর্তমান ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে তাও অসাংবিধানিক বলে জানা গিয়েছে। তিনজনেই অবসর নিয়েছেন জেলা আদালত থেকে।যাদের হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এরপর জামায়াতে ইসলামী চাপ দিয়ে ২২ জনকে স্থায়ী বিচারপতি পদে নিয়োগ করেছে যাদের বছর খানেকের বেশি অভিজ্ঞতা নেই। আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা তো নেইই। কেউ কেউ আবার বিএনপি এর সদস্যও ছিল। এরকম একজন রাজনৈতিক কর্মীকে আইসিটির বিচারক হিসাবে নিয়োগ যে বিশেষ উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট। পক্ষপাতিত্ব তো বটেই।

সুতরাং এইসব বিচারপতিদের দেওয়া রায় যে প্রহসন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।আসলে ক্ষমতাহীন শেখ হাসিনা যে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জনপ্রিয়তার থেকে কোন অংশে কম নয় তা ইউনূস ও তার বশংবদদের আতঙ্ক থেকেই প্রমাণিত। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতি হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা শান্তিতে থাকতে পারছে না। তার ওপর আওয়ামীলীগের কয়েকশো নেতা কর্মীদের ওপর মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার বৈধতা নিয়ে সন্দেহ আছে। অন্তবর্তিকালীন সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আগামী নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে দেওয়া হবে না তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এরই মধ্যে জামায়েত ইসলামী তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িয়েছে।পাকিস্তান রীতিমত সরকারের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষকে আবার মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হতে হচ্ছে এঘটনা প্রতিবেশী দেশ

হিসাবে ভারতের কাছে যে অতীব বিড়ম্বনা ও দুঃখের, বিশেষকরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল সেই দেশের পক্ষে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রতিবেশী দেশের স্থিতি বিঘ্নিত হলে তার প্রতিফলন ঘটে আমাদের দেশের ওপর। তাই ভারত চায় সেই দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা সরকার নির্বাচিত হোক। কিন্তু বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের আচরণে তার প্রকাশের বদলে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, রাগ ও প্রতিহিংসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ গণতন্ত্রের পরিসরকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। তার সঙ্গে রয়েছে উগ্র ধর্মীয় হিংসা ও হুমকি। শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যে পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলল তাতে বাংলাদেশের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হল তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সেই দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয় জ্জ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি জামাত এ ইসলামি ও মুসলিম লীগের সহায়তায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি গণহত্যাকারী সংগঠন গঠিত হয়। এরা পাক সেনাবাহিনীকে নির্বিচারে গণহত্যা ও ধর্ষণে সহায়তা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতার পর এই শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট মাঝরাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সামরিক বাহিনীর একাংশের সাহায্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার সহ নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ঘটনাক্রমে শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন বিদেশে থাকায় রক্ষা পান। এই হিংস্র পাশবিক শক্তি এরপর ৩ নভেম্বর ঢাকা জেলে ঢুকে চার জাতীয় নেতাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।

এরপরই লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি খালেদ মোশাররফ সহ একদল দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করান। তিনি রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এর সাহায্যে এই মর্মে একটি আইনি আদেশ জারি করেন যে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকারীদের কোনও বিচার কখনোই করা যাবেনা। এরপর জিয়াউর নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এক হাজারের বেশি সেনাকে জিয়াউর রহমান বিদ্রোহের পরিকল্পনার সাজানো অভিযোগে বিনা বিচারে ফাঁসি দেন। অবশেষে তিনি ১৯৮১ সালের মে মাসে সামরিক বাহিনীর হাতেই নিহত হন। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসেন তখন ক্ষমতায় জেনারেল এরশাদ। গণতন্ত্রের দাবিতে এক দশক তীব্র আন্দোলনের পর গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে নির্বাচনে জয়ী হন। মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত তাঁর ওপর বারবার জীবন নাশের জন্য আক্রমণ হয়। শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে। নানা ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই উন্নয়নে বাধা দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য ঋণ দেয়নি। বাংলাদেশ নিজের অর্থে ওই সেতু নির্মাণ করেছে। গত জুলাই অভ্যুত্থানের পর জামাত শিবির মোহাম্মদ ইউনূসকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। যোগ্য নির্বাচন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের Deep State পরিকল্পনায় এই পালা বদলের জন্য কয়েক হাজার কোটি ডলার খরচ হয়েছে জ্জ এই সত্যটা ট্রাম্প এসে বলে দিয়েছেন। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইউনূস বলেছেন গত বছরের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিলনা, এর পিছনে ছিল, Meticulous Design. তিনি একথাও বলেন যে তারা Reset button push করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ আর ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের যুগে ফেরত যাবেনা।

এই সরকার বাংলাদেশকে একটি হিংস্র দেশে পরিণত করেছেন। খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি নিত্য ঘটনা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বাউল-ফকির, আদিবাসী সবাই আক্রান্ত হচ্ছেন। বিস্তৃত বিবরনের প্রয়োজন নেই। বিচার ব্যবস্থা মানে Mob trial. দেশের অর্থনীতি চৌপাট। শেখ হাসিনার বিচার সমস্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন প্রত্যাখ্যান করেছে।

বাংলাদেশে বাউল আবুল সরকারকে গ্রেফতার কি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ?

জাকির তালুকদার

মোটেই না। এটি ইউনূস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সালাফি-ওহাবি মৌলবাদীদের মেটিক্যুলাস প্ল্যানের অংশ। সুফিরা কোরআনের ভিন্ন তাফসির করেছেন। যেমন সদর উদ্দীন চিশতীর তাফসির। এটি মওদুদী সাহেবের তাফসিরের সাথে মিলবে না। অনেকেই বলেন লালনের তাফসির আছে অলিখিতভাবে তাঁর শিষ্যদের মুখে মুখে। সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে তাঁর গীতিগুলো থেকে বোঝা যায় এমন কিছু থাকতেও পারে।

সুফি-বাউলরা যে তাফসির ব্যবহার করেন তা শরিয়তসর্বস্ব না হয়ে অনেক বেশি মানবিক, মায়াময় এবং লোকজ। একই সাথে তাঁরা

জানিয়ে দেন যে নামাজ-রোজার পাশাপাশি যদি হালাল রুজি না হয়, তাহলে সেই ইবাদত শুধু অকার্যকরই নয়, বরং আল্লাহর সাথে প্রতারণারও শামিল।

এই ধরনের কথাই বলেছেন বাউল আবুল সরকার। এবং এই ধরনের কথা আমাদের সমাজের, রাষ্ট্রের, ধর্মের নেতাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাদের অধিকাংশই হজ করেন এবং ঘুষও খান। তাই আবুল সরকারকে চুপ করাতে হবে।

বলছিলাম, ৫ই আগস্টের পর থেকে মাজার পোড়ানো, বাউলদের অনুষ্ঠান পণ্ড করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে লালন উৎসব করতে না দেওয়া, ওরস-মিলাদের বিরোধিতা করা-- সবকিছুই একটি মেটিক্যুলাস প্ল্যানের অংশ। প্ল্যানটা হচ্ছে শরিয়া ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা। শরিয়া আইনে পরিচালিত রাষ্ট্র মানে সেখানে কোনো গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না, নারীদের ওপর নেমে আসবে নিষেধের খড়্গ, কোনো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থাকবে না, ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সেখানে থাকতে হবে জিজিয়া কর দিয়ে। এককথায় মধ্যযুগীয় দুঃস্বপ্নের দেশ তৈরি করার নাম হচ্ছে শরিয়া আইনের দেশ।

বাহ্যত এই রকম রাষ্ট্র কায়েমের প্রধান বাধা হচ্ছে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ, সাহিত্যকর্মীবৃন্দ, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ।

কিন্তু এইসব মাজারপন্থি, সুফিপন্থি সাধকরা, বাউলরাও সালাফি-ওহাবিদের কাছে খুব বড় বিপদ। কারণ এই ধারার সাধকরা অনেক বেশি মাটিলগ্ন, কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের খুব প্রিয়, এই সাধকদের ভাষা অশিক্ষিত মানুষরাও বুঝতে পারে। শরিয়া রাষ্ট্র কায়েমের ক্ষেত্রে এই আবুল সরকারের মতো মানুষরা অনেক বড় বাধা। তাই এঁদের পাশে আমাদের দাঁড়াতেই হবে।

সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত

এই বছর (২০২৫) ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের বর্ষ।

ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্যসাধারণ যোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও সত্যাগ্রহী। তিনি মহাত্মা গান্ধির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে বৃটিশ সরকারের উচ্চপদে ইস্তফা দেন। তিনি তদানীন্তন মানভূম (অধুনা পুরুলিয়া হল মানভূমের খন্ডাংশ) জেলায় আদিবাসী, হরিজন ও পিছিয়েপড়া মানুষদের নিয়ে ১৯২২ সাল থেকে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেন। তাই তাঁকে 'মানভূমের গান্ধী' নামে অভিহিত করা হয়।

তাঁর নিরহংকার, আত্মনিবেদিত ঋষিসুলভ জীবনযাপন ও জাতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের কারণে তাঁকে 'ঋষি নিবারণ' নামে আজও উল্লেখ করা হয় এবং মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক বলা হয়।

তাঁর জন্ম- ২৫ এপ্রিল ১৮৭৬। জন্মস্থানঝুগাউপাড়া, কুমারভোগ, লৌহজং, বিক্রমপুর (বর্তমান বাংলাদেশ) পিতা ছিলেন তারকনাথ দাশগুপ্ত। শৈশবকাল থেকেই নিবারণচন্দ্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অধ্যবসায়ী এবং সত্যনিষ্ঠ। শিক্ষা জীবনের শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায, পরে বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা এবং ১৮৯৫ সালে এফ.এ. পাশ করেন। বি.এ. পড়াশুনার সময় তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পরিবারের চাপে আবার ঘরে ফিরে আসেন এবং ১৮৯৮ সালে লাবণ্যময়ীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯০০ সালে বি.এ. পাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ দেন। প্রথমে মেদিনীপুরে সহকারী স্কুল পরিদর্শক হন। পরে মানবাজার ও ঝালদায় বদলি হয়ে যান। ১৯১৪ সালে বি.টি. পাশ করে ১৯১৬ সালে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সম্মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। শিক্ষকজীবনে তিনি ছাত্রদের চরিত্রগঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতেন এবং পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা দিতেন। জনগন তাঁর গীতা ও উপনিষদের সুললিত ব্যখ্যা মুগ্ধ হয়ে শুনতো।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক পেয়ে তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করেন। তখন তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক এবং মানভূম জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরি ছেড়ে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারা মুক্তির পর মানভূম অঞ্চলে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরু করেন। প্রতিষ্ঠা করেন তিলক জাতীয় বিদ্যালয় এবং শিল্পাশ্রম। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করেন এবং 'মুক্তি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন যা অচিরেই জেলা এবং জেলার বাইরেও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হয়ে ওঠে।

এই সময় জেলার স্বনামধন্য উকিল অতুল চন্দ্র ঘোষও তাঁর পেশা পরিত্যাগ করে সপরিবারে নিবারণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিল্পাশ্রমে যোগ দেন এবং তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে মানভূম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে

উত্তাল হয়ে ওঠে। শিল্পাশ্রম পরিণত হয় দেশের ও জেলার সাধারণ মানুষ এবং তখনকার দেশনেতাদের নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত গন্তব্যস্থলে। এটি মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কেন্দ্রস্থলও হয় ওঠে।

এই সময় শিল্পাশ্রম ছিল দেশবন্ধুর বাংলোর পাশের এক ভাড়াবাড়িতে। শহরের ধনী এবং দানী ব্যবসায়ী হরিপদ দাঁ নামে তাঁর একজন অনুরাগীর দানে পুরুলিযার তেলকলপাডায শিল্পাশ্রম-এর স্থাযী গৃহ নির্মাণ হয়। এই শিল্পাশ্রমই সেইসময মানভূমে স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয যা আগেই বলা হয়েছে। স্থাপনার পরবর্তী দুই দশক 'শিল্পাশ্রম'ই ছিল স্বাধীনতা

সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল। অহিংস পথে বিশ্বাসী হলেও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বিশ্বাসী যুবকদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের জন্য। তাঁরাও শিল্পাশ্রমে এসে গোপনে থাকতেন। অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র পাকরাশি তাঁর গ্রন্থ 'অগ্নিযুগের কথা'য় লিখেছেন ১৯৩২-৩৪ সালে যখন তিনি হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দি তখন সেখানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে শত শত অসহযোগী বন্দি হয়ে আসেন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ , ঋষি নিবারণচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী । স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা ও অহিংস পথ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সতীশ বাবুদের বিতর্ক হত, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অতীব সুন্দর । কিছুদিন পর আচার্য কৃপালনিকেও ওই জেলে নিয়ে আসা হল । এমন সময় খবর এলো মাস্টারদা সূর্য্য সেনের ফাঁসি হয়েছে। এই সংবাদ শুনে আমরা সবাই খুব শোকাহত হলাম। কিন্তু ঋষি নিবারণচন্দ্র শিশুর মতো ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি বললেন এরকম একজন দেশভক্ত দেশের জন্যে জীবন দান করলেন অথচ আমরা কোনো আত্মত্যাগ করতে পারলাম না। কয়েকদিন পরেই সতীশ চন্দ্রর আন্দামান সেলুলার জেলে বদলির নির্দেশ এলো। সবাই খুব দুঃখিত হলেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ;এরকম মানুষ ছিলেন ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই আশ্রম হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে নিবারনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পাশ্রম থেকেই যা আজ অযত্ন এবং অবহেলার শিকার। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'মুক্তি' পত্রিকায় নিবারণচন্দ্রের বিপ্লব শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হলে তিনি আবার রাজরোষে পড়েন এবং তাঁর এক বৎসরের কারাদন্ড হয়। মুক্তির পর তিনি মানভূম জেলার রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রেস অর্ডিন্যান্স এর কারণে দেশবন্ধু প্রেস ও মুক্তির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিযে পুনরায ছয় মাসের কারাদন্ড ভোগ করেন নিবারণ চন্দ্র। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পাওযার পর তিনি কাঁথি, শ্রীহট্ট সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা বিষযে বক্তৃতা করেন। শিল্পাশ্রমের কর্মীদের শিক্ষাদানে রঘুনাথপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে অস্থাযী শিবিরও স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তার দেড় বৎসরের কারাদন্ড এবং শিল্পাশ্রম বেআইনি ঘোষিত হয়।

কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। কিছুদিন তিনি রাঁচিতে বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যাযের চিকিৎসায ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল তাঁকে দেখতে তাঁর শয্যার পাশে আসেন মহাত্মা গান্ধিজী। সেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত শিল্পপতি ও গান্ধী শিষ্য যমুনালাল বাজাজ ও বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। নিবারণচন্দ্র রাঁচির উপজাতি খেড়িয়া ও হরিজনদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে ওই এলাকাটির নামকরণ করা হয় নিবারণপুর।

পুরুলিয়া শহরের মূল প্রানকেন্দ্রে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও পার্ক আছে এবং শহরের মূল রাস্তাটি ও মূল জলাশয়টিও (সাহেব বাঁধ) তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে।

জীবনের শেষ কয়েকদিন নিবারণচন্দ্র রাঁচী ত্যাগ করে তাঁর স্বপ্নের পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে এসে গীতা পাঠ করে কাটান। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই তিনি প্রয়াত হন। তার স্ত্রী লাবণ্যময়ী ১৯১৫ সালে মারা যান। তার পুত্র-কন্যারা (বিভূতিভূষণ, চিত্তভূষণ, মালতী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী) স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রবন্ধ

লালন ফকিরের উপর সুফিবাদের প্রভাব

তানভীর মোকাম্মেল

(লেখক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য, সমাজ, সঙ্গীত, লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধকার । লেখক এই বিষয়ের ওপর তাঁর এই বক্তৃতাটি ইংরেজি ভাষায় প্রদান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুবাদ লেখকের নিজস্ব। অতীব মূল্যবান এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। আজ প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল। -- সম্পাদক, নাগরিক)

একটা জাতি হিসেবে মননশীল বিষয়সমূহে আগ্রহ ও শৈল্পিক দিকে ঝোঁক থাকলেও দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের বাঙ্গালিদের অবদান আবার অতি যৎসামান্য। লালন ফকির (? -১৮৯০) সেক্ষেত্রে এক বড় ব্যতিক্রম। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই লালন ফকির দার্শনিক জিজ্ঞাসার কিছু মূল মূল প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন- ঈশ্বর কে ? এই বিশ্বব্রহ্মান্ড কী ভাবে সৃষ্টি হোল ? আমি কে ? স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কি ? অস্তিত্ববাদী ও সৃষ্টির রহস্য সংক্রান্ত এসব প্রশ্ন তোলা, এবং যেভাবে লালন সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন, তা' আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্যতিক্রমী। এই দার্শনিক ধারাটি অবশ্য মধ্যযুগের বাংলার বাউল-ফকিরদের সাধনার ধারার মধ্যেই নিহিত ছিল যার উপর ছিল মানবদেহকেন্দ্রিক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব, নাথ-বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনতত্ত্ব এবং ইসলামী সুফিবাদের সুগভীর প্রভাব। সাঙ্গীতিক এই ধারাটিতে অসংখ্য গুরুর হাজার হাজার হেঁয়ালীপূর্ণ পদ যুগে যুগে রচিত ও গীত হয়েছে। কিন্তু ওঁর অতলান্ত গভীরতা ও শৈল্পিক সূক্ষ্মতা নিয়ে লালন ফকির ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচে প্রতিভাবান এবং সবার শীর্ষে।

এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে সুফিবাদের জন্ম যদিও ঘটেছিল মধ্যপ্রাচ্যে, কিন্তু তা' বেশী বিকশিত হয়েছে মুসলিম জগতের প্রান্তস্থ দেশগুলিতে-পশ্চিম আফ্রিকায়, মধ্য-এশিয়ায় এবং ভারতবর্ষে। বাংলায় প্রবেশের আগে উত্তর ভারতেই সুফিরা যোগী ও অন্যান্য তান্ত্রিক সাধকদের নিকট সাহচর্য্যে এসেছিলেন;

'বিভিন্ন ভারতীয় সুফি গ্রুপ, বিশেষতঃ চিশতী ও সাত্তারি ঘরানার সুফিরা তাদের সাধনপ্রক্রিয়ায় যোগীদের অনেক চর্চাকে ধারণ করে নিয়েছিলেন। তবে এই সংযোগের দ্বারা সুফিদের প্রচলিত চর্চাগুলির ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু মন্ত্রসমূহ সুফি রচনায় প্রায় অনুপস্থিত, এবং যেটুকু যা আছে, কোরানীয় উৎসের আরবী সুত্রসমূহের নীচেই তার অবস্থান। অধুভান্ডদ (তদি পুল অব নেকটারদ) হয়তো ছিল ইসলামী ভাষাসমূহের মাধ্যমে যোগচর্চা ছড়ানোর একমাত্র গুরত্বপূর্ণ উৎস। সুফি ও যোগীরা উভয়ই অবশ্য মাঝে মাঝেই পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।'৬২

ফলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে বাংলা, যা ছিল ইসলামের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরের এক সীমান্ত, সুফিবাদ সেখানে মোটেই নির্ভেজালভাবে পৌঁছায়নি। তাছাড়া সুফিবাদের মাত্র একটাই কোনো একক ধারাও বাস্তবে কখনো ছিল না ; 'সপ্তদশ শতক থেকে বাংলায় সুফিবাদ একটা নতুন রূপ গ্রহণ করল এবং পরবর্তী দেড় শতকের মধ্যে বিশ্বাসে ও চর্চায় স্থানীয় ভাবধারা এত বেশী গ্রহণ করে ফেলল যে তা কেবল তার আদি কুলীন রূপ ও স্বাতন্ত্র্যই হারাল তাই নয়, তার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব, অন্তর্নিহিত শক্তি ও অকপট চরিত্রও হারাল। এসব কিছু হারোনোর ফলে বাংলায় সুফিবাদ তান্ত্রিকতা, যোগীবাদ, নাথতন্ত্র ও এই ধরণের নানা লোকজ বিশ্বাস ও সাধনচর্চায় একাত্ম হয়ে গেল।'৬৩

বাংলায় সুফীবাদের প্রভাবকে বুঝতে গেলে এদেশে ইসলামের এই সমন্বয়বাদিতার প্রেক্ষাপটে সেটা বোঝাটা জরুরী। প্রসারের জন্যে সুফিবাদকে বিভিন্ন অ-ইসলামী বিশ্বাস ও সাধনচর্চার মধ্যে ঢুকতে হয়েছিল। তাছাড়া প্রথম দিককার সেই দিনগুলিতে জনপ্রিয়তা অর্জন ও তা বজায় রাখতে সুফি আউলিয়াদেরকে প্রাচীন বাংলার অনেক সাধনচর্চাকেই তাঁদের নিজস্ব রীতি-নীতিতে, এমন কী বিশ্বাসেরও, অনুষঙ্গ করে নিতে হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আমরা এই ধর্মীয় সমন্বয়বাদিতার ব্যাপক রূপটার একটা প্রকাশ দেখতে পাই বাংলার বাউল-ফকিরদের মাঝে। লালন ফকির ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচে গুরত্বপূর্ণ। ফলে এটা স্বাভাবিক যে সমন্বয়বাদিতার এই ধারার অনেক উদাহরণই লালনের মাঝেও তাই দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলায় সুফিবাদের প্রকাশের দেখা মেলে মূলতঃ দুই ভাবে। এক হচ্ছে নানা তাত্ত্বিক আলোচনায়, আরেকটা রূপ বাউল-ফকির এসব মাধুকরী সঙ্গীতশিল্পীদের সংগীত ও সাধনার মাঝে। লালন ফকিরের মধ্যে এই দুই ধারাই এসে মিশেছিল। একজন সঙ্গীতসাধক হিসেবে ওঁর গান ছিল জনপ্রিয়। আবার নানা দ্ব্যর্থবোধক অর্থ, হেঁয়ালী ও রূপক নিয়ে সে সব গান আবার তত্ত্বকথাতেও ভরপুর। সুফিবাদের প্রথম দিনগুলি থেকেই এক ধরণের প্রবণতা ছিল আশ্রমভিত্তিক একটা সম্প্রদায় গড়ে তোলা। লালন ফকির যদিও মাধুকরী করতেন, তবুও কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে তিনি নিজের রীতিমতো একটা আশ্রমও গড়ে তুলেছিলেন। শরীয়তপন্থীদের দ্বারা সুফিদেরকে যেরকম প্রান্তে ঠেলে রাখা হো'ত তেমনি লালন ও ওঁর অনুসারীদেরকেও স্থায়ীভাবেই জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। শরীয়তপন্থী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে বাউল-ফকিরেরা হচ্ছে বাইরের অন্ত্যজ মানুষ, এক বিপজ্জনক সম্প্রদায়, যাঁরা তাঁদের হেঁয়ালীপূর্ণ গানের মাধ্যমে কর্তৃত্বশালী ধর্মগুলির দিকে নানা অন্তর্ঘাতমূলক প্রশ্ন ছুঁড়ে এসব ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দূর্বল করে দিতে সদা তৎপর!

আমার এরকমটা মনে হয়েছে যে নিজের জীবনকাহিনীটা না বলার ব্যাপারে লালন ফকিরের দিক থেকে একটা সচেতন প্রয়াস যেন ছিল। ওঁর জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে জানার ব্যাপারে উনি নিজেই যেন কিছুটা ধোঁয়াশা ছড়িয়ে রেখেছেন ! ফলে যেটুকু যা জানা যায় তা

যতটা না তথ্যনির্ভর তার চেয়ে বেশী কল্পকাহিনীতে ভরা। ফলে ওঁর গান, এবং কেবল গানগুলোর মধ্য দিয়েই, মানুষটিকে ও তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বাকে, আমাদেরকে বুঝে নিতে হচ্ছে। গান, বাদ্যযন্ত্র ও দমের নানারকম চর্চা তান্ত্রিক-সহজিয়া সাধনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং লালনের গানের যে নৃতাত্ত্বিক-সাঙ্গীতিক (Ethnomusicology) ধারা, বাংলার দেহতান্ত্রিক সাধকদের সাধনার তা এক বহু সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই। এ ধরণের হেঁয়ালিপূর্ণ গান লেখা হোত গুরুর দ্বারা শিষ্যদেরকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান শেখানোর জন্যে। তাই এই সব গানের ছিল দ্বৈত স্তর। উপর উপর তা' ভক্তিমূলক বা প্রেমের গান। কিন্তু অন্তঃসলিলে প্রবাহমান রইত এক গূঢ় সান্ধ্যভাষা যার মাধ্যমে গুরু তাঁদের যৌনাত্মক সাধনচর্চার কথা ভক্তদেরকে শিখিয়ে থাকেন।

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ত্বাউলদ ও তফকিরদ শব্দ দুটি অনেক সময়ই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এ দুটি ধারার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ত্বাউলদ শব্দটির কোনো একটিই সংজ্ঞা নেই। বাংলার ভদ্রসমাজের কাছে ত্বাউলদ শব্দটি ইদানীং একটি সর্ববর্গীয় (মবহবৎরপ) শব্দে পরিণত হয়েছে যা দিয়ে লোকায়ত সাধনার নানা রকম সাধকদেরই বোঝায়। এমনকী সুফি ত্দরবেশদ দেরও বোঝায় ! অষ্টাদশ-উনিশ শতক দুটিতে, হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথা ও ইসলামী ওয়াহাবী মৌলবাদীদের দ্বারা নিপীড়নের কারণে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাদের নিজেদের মতো করে নানারকম সমতাধর্মী উপধর্ম গড়ে তুলেছিলেন-ত্কর্তাভজাদ, ত্সাহেবধনীদ, ত্বলরামভজাদ এসব। ত্বাউলদ ও তফকিরদ এই ধারা দুটির সৃষ্টি যদিও অনেক আগে, তবুও বাংলার ইতিহাসের ওই সমন্বয়বাদিতার কালে এসব মতবাদ গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে এবং এই দুই ধারার মাঝের সীমান্তটা পরস্পরকে ছাপিয়ে যায়। সাধারণ মানুষদের কাছে অনেক সময়ই তাই 'বাউল' ও তফকিরদ এই দুই ভিন্নধর্মী ধারা একাকার হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই সুফিবাদের একটি ধারা দ্বারা প্রভাবিত ত্নাড়ার ফকিরদ-দেরকে ত্বাউলদ বলেই ডাকা হয়ে থাকে !

শরীয়ত-তরিকত-হকিকত-মারেফত সুফিবাদের এসব সাধনার মধ্যে মারফতী ধারার সাধনাই, যেখানে ঈশ্বরের-সঙ্গে-একাত্ম-হয়ে-যাবার কথা বলা হয়েছে, বাংলার সাধকদের উপর সবচে বেশী প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে। লালনের ভাষায়;

'আলেফে আল্লাজি, মিম মানে নবি
লামের হয় দুই মানে
এক মানে হয় শরায় প্রচার
আরেক মানে মারফতে ' ৬৪

বাংলার ফকিরেরা কখনোই শরীয়তী রীতিনীতির অনুসারী ছিলেন না। বরং মারফতী ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠানবিরোধী ও অন্তর্ঘাতমূলক প্রবণতাই তাঁদেরকে বেশী আকর্ষণ করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁদের গোটা বিশ্বাসের জগতটাই ছিল শরীয়তী রীতিনীতির বিপক্ষে। লালন বলছেন;

'শরাকে সরপোষ লেখা যায়
বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়
সরপোষ থুই তুলে কি দেই ফেলে
লালন বস্তু ভিখারী ।।' ৬৫

লালনপন্থীরা হচ্ছেন বীর্য্য তথা বস্তুবাদের সাধক যাঁরা মানবদেহের ভেতরে বসবাসকারী 'সহজ মানুষদ বা তঅচিন মানুষদ-য়ের সন্ধানী। দেহের ভেতরে বসবাসকারী বস্তু বা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার বাংলার বাউল-ফকিরদের যে সাধনা তার সঙ্গে সুফি সাধকদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি, আশেক ও মাসুকের মধ্যেকার মিলনের আকাঙ্খার কিছু মিল রয়েছে। তবে ঈশ্বরের প্রতি সুফিদের ভালবাসা অনেকটাই অশরীরী ভালোবাসা। কিন্তু স্রষ্টার সঙ্গে লালনের মিলনাকাঙ্খা, অচিন মানুষ-কে ধরার সাধনা, এক বস্তুবাদী শারীরিক প্রক্রিয়া, এক ধরণের যৌন যোগতান্ত্রিকতার চর্চা। বাউলেরা বায়ু-সাধক। লালন-ঘরানার গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক সাধক ও অত্যন্ত সম্মানিত একজন গুরু মহিন শাহের মতে, যে ব্যক্তি মানবদেহের মধ্যেকার বায়ুসঞ্চালনকে দমের সাধনার মাধ্যমে আয়ত্ত করে পাঁচটি স্তর 'ব্যায়াম', 'অপাল', 'নাশ', 'কুম্ভ' ও 'মোক্ষ' অতিক্রম করতে পেরেছেন, তিনিই বাউল।৬৬ ৩৬ এই পর্যন্ত হয়তো নাথ-তান্ত্রিক যোগসাধনা। কিন্তু এর পরে মহিন শাহ যোগ করেন যে, যে ব্যক্তি চার পেয়ালা ত্ফানাদ অর্জন করেছেন, তিনিই বাউল। এখানে 'ফানা' শব্দটির ব্যবহার এবং লালনের গানে 'মোকাম', 'লতিফা', 'রাব্বানা', 'পাঞ্জাতন' এসব সুফি পদের ব্যাপক ব্যবহার তুলে ধরে যে লালন ও ওঁর শিষ্যরা সুফিমতের তর্ক-বিতর্কগুলির সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং সুফী পদগুলির এরকম ব্যাপক ব্যবহার লালন-অনুসারীদের মাঝে নানা প্রক্রিয়ায় সুফিবাদ ও নাথ সহজিয়া সাধনচর্চার সংমিশ্রিত হওয়ারই উদাহরণ।

যদিও লালন ফকিরের গান আজকের বাংলার বাউলদের গানের এক বড় অংশ, তবে লালন কিন্তু নিজেকে 'বাউল' বলতেন না। বলেছেন 'লালন ফকির'। ছেঁউড়িয়ার লালন-ঘরানার একজন শ্রদ্ধেয় গুরু ফকির আবদুল গণি বাদের শাহ আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে তাঁরা 'বাউল' নন-'ফকির'৬৭। লালনের মতে তফকিরদ হচ্ছেন 'তাঁরা' যাদের দর্শন হচ্ছে ;

'ডানে বেদ বামে কোরান
মাঝখানে ফকিরের বয়ান'।৬৮

লালন কখনোই শাস্ত্রীয় কোনো গোঁড়ামিতে এবং ইসলামী বিশ্বাসের এই মূল ধারণাটিতে বিশ্বাসী ছিলেন না যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত ছিল;

'কী কালাম পাঠালেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কয় খোদায় পাঠায়।
যদি একই খোদার হয় রচনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা
তাইতে ভিন্ন হয় ।।'৬৯

বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ লালন ও তার অনুসারীদের যেরকম তবায়বীয় বাউলদ হিসেবে নির্মাণ করে নিয়েছে বা দেখতে পছন্দ করে থাকে, লালন ও ওঁর অনুসারীরা কখনোই তেমনটি ছিলেন না। লালন ও ওঁর অনুসারীরা ছিলেন তবর্তমানপন্থীদ, দৃঢ়ভাবে বস্তুবাদী ও বর্তমান জীবনের পক্ষে। যা তঅনুমানপন্থাদ, বা অদেখা আধ্যাত্মিক জগত, তা' থেকে একেবারেই বিপরীত ছিল ওঁদের এই অবস্থান। লালন গাইছেন;

'সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে
পাবি রে অমূল্যনিধি বর্তমানে
ভজ মানুষের চরণ দু'টি
নিত্য বস্তু পাবে খাঁটি
মরিলে হবে সকল মাটি
ত্বরায় এই ভেদ লও জেনে।
মলে পাব বেহেস্তখানা
তা শুনে তো মন মানে না
বাকীর লোভে নগদ পাওনা
কে ছাড়ে এই ভুবনে।'৭০

ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস ২০৫তম জন্মদিবস

মধুশ্রী বন্দোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত কি মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হল?

বহু ব্যর্থতা, বহু ত্রুটি সোভিয়েত ব্লক-এ ছিল। তবে এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগে শুধু একটা কথা বিবেচনা করতে বলি।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতেন শুধু বিপুল দরিদ্র্য মানুষ আর সামান্য কিছু অতি ধনী। গত ১০০ বছরে বিশ্বে দারিদ্র্য অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটা ছোট্ট উপাত্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

১৯১০ সালে চরম দারিদ্র্যে সারা পৃথিবীর প্রায় ৮২.৪ শতাংশ জনমানুষ থাকতেন, সেখান থেকে ২০২৫ সালে চরম দারিদ্র্যে থাকা মানুষের সংখ্যা কমে ১০ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যার ব্যাপক হ্রাস হয়েছে;এই হ্রাস হয়েছে পূর্ব ইউরোপে, রুশ এশিয়াতে, চীনে। চীনের তুলনায় অতি ধীরে হলেও - ভারতে।

সোভিয়েত ব্লক-এর এই চাপ, এই দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতেই রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করেছে দেশের দরিদ্র্য মানুষের কথা ভাবতে। গত শতকে দুই মেরু বিশ্ব খামোখা তৈরি হয়নি। অথচ এই সময়েই পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ১৮০ কোটি থেকে ৭০০ কোটিতে।

সফলতা বা ব্যর্থতার মাপকাঠি কী সেটাও ভাবতে হবে।

ছোটোবেলাতে হলিউডের ফিল্ম দেখে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় হয়েছে আমেরিকার জন্য। কারোর অবদানকে খাটো না করেও বলা যায়, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীই বার্লিনে গিয়ে যুদ্ধ শেষের বার্তা পৃথিবীকে দিয়েছে।

কেন এই কথার অবতারণা করলাম? বিজ্ঞাপন, প্রচার;সত্যের মুখকে অনেক সময়ে ঢেকে দেয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। আমরা যা পেয়ে গেছি, তা জীবনের অংশ হয়ে যায়। তার আলাদা কোনো তাৎপর্য আর থাকে না। যে দারিদ্র্য ছিল পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবনের অংশ তার থেকে সরে আসবার পরে ইতিহাসের পাতা ওল্টানোর প্রয়োজন আর থাকে না। সেটা স্বাভাবিকও বটে। সকল মানুষ আরও উন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাতে যেতে চায়;আমরা সকলেই চাই। তার জন্য যুগের উপযোগী নতুন কিছু ভাবতে হবে। কিন্তু তা পুরো যাত্রাপথকে অস্বীকার করে নয়।

শেষ বিচারে, মতামত তৈরি করার সময়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর অবদানকে স্মরণ করতে হবে বৈকী।

শুধু অর্থনীতি নয়, শুধু ফ্যাসিবাদ-এর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা নয়, আধুনিক সমাজে নারীর স্থান কোথায় হবে তা নিয়েও যে

সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। পূর্ব ইউরোপ-এর দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র অস্ত গেছে। চীনের অর্থনৈতিক মডেল নিয়ে প্রশ্ন আছে প্রচুর।

বক্তব্য ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস রেখেছেন তার উপরেই পরবর্তী অগ্রগতি হয়েছে। নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য যারা লড়াই করেন তাদের এক সময়ে অবশ্য পাঠ্য ছিল 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থটি। লেখক কার্ল মার্কস-এর আজীবন বন্ধু, সবচেয়ে কাছের সহযোগী, মার্কসবাদের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস।

২৮ নভেম্বর তাঁর ২০৫ তম জন্মদিবস।

যদি তাঁকে একেবারে না জানি, অথচ নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে লড়াই করি, তবে বইটি একবার পড়ে দেখতে পারি, জানতে চাইতে পারি তাঁর জীবনকে।

(লেখক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ।)

ভারতের সংবিধান সম্পর্কে কিছু সাধারণ কথা

মজিবুর রহমান

সংবিধান (কনস্টিটিউশন) হল একটি দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন ও বিধিবিধানের সমষ্টি। সকল ফৌজদারি অথবা দেওয়ানী আইনকে সংবিধানের অনুসারী হতে হয়। কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংস্থা বা সংগঠনের নিয়মাবলী সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কোনো জাত বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুশাসনও দেশের সংবিধানের পরিপন্থী হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সুলিখিত ও সুনির্দিষ্ট সংবিধান গ্রন্থস্থ থাকলেও যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল ও নিউজিল্যান্ডের মতন কিছু দেশে কোনো একক সম্পূর্ণ সংবিধান নেই। এই দেশগুলোর শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন আইন, আদালতের রায় ও প্রচলিত রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি ১৯৪৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এভি আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ ভারতে আসে। ক্যাবিনেট মিশন ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য একটি সংবিধান সভা বা গণপরিষদ (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) গঠনের প্রস্তাব করে। সংবিধান সভার মোট সদস্যসংখ্যা ঠিক হয় ৩৮৯; প্রাদেশিক আইনসভা থেকে ২৯৬ জন ও দেশীয় বা করদ রাজ্য (প্রিন্সলি স্টেট) থেকে ৯৩ জন।জুলাই-আগস্ট মাসে গণপরিষদ গঠন সম্পন্ন হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর ভারতে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৯- প্রাদেশিক প্রতিনিধি ২২৯ ও দেশীয় প্রতিনিধি ৭০।

৯.১২.১৯৪৬ তারিখ গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য সচ্চিদানন্দ সিনহার (১৮৭১-১৯৫০) সভাপতিত্বে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ১১ই ডিসেম্বর স্থায়ী সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩)। সাংবিধানিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন বি এন রাউ (১৮৮৭-১৯৫৩)। ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) 'উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব' (অবজেক্টিভ রেজোলিউশন) পেশ করেন। ২২.১.১৯৪৭ তারিখ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে সংবিধানের প্রস্তাবনা (প্রিয়েম্বল) হিসেবে যুক্ত হয়। প্রস্তাবনা হল বৃহৎ সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্তসার। ১৫.৮.১৯৪৭ তারিখ স্বাধীনতা লাভের দিন থেকে সংবিধান সভা ভারতের সংসদ (পার্লামেন্ট) হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে। সংসদের কাজ পরিচালনা করার জন্য জি ভি মবলঙ্কর স্পিকার নির্বাচিত হন।

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য গণপরিষদ ২২টি কমিটি গঠন করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল খসড়া প্রণয়ন (ড্রাফটিং) কমিটি। ২৯.৮.৪৭ তারিখ এই কমিটি গঠন করা হয়। সাত সদস্য বিশিষ্ট খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ভারত সরকারের তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. বি আর আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬)। কমিটির বাকি ছয়জন ছিলেন কে এম মুন্সি, বি এল মিটার, ডি পি খৈতান, এন গোপালস্বামী আয়ঙ্গার, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও মোহাম্মদ সাদুল্লাহ। খসড়া কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে ২১.২.৪৮ তারিখ। খসড়া প্রতিবেদনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বহু সংখ্যক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত এবং বেশ কিছু গৃহীত হয়। শেষমেশ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে ৩৯৫টি ধারা (আর্টিকেল), ৮টি তফসিল ও ২২টি অংশ (পার্ট) সম্বলিত সংবিধান চূড়ান্ত করা হয় এবং তাতে স্বাক্ষর করেন সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। গণপরিষদের অন্যান্য সদস্যরা স্বাক্ষর করেন ২৪.১.৫০ তারিখ। সংবিধান পুরোপুরি ভাবে কার্যকর হয় ২৬.১.৫০ তারিখ থেকে। ১৯৫১ সাল থেকে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র হিসেবে উদযাপন করা হয়। কিন্তু ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পরাধীন ভারতে ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা

দিবস হিসেবে উদযাপন করা হত। ২০১৫ সাল থেকে ২৬শে নভেম্বর সংবিধান দিবস বা জাতীয় আইন দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ২৬.১১.১৯৪৯ তারিখটির উল্লেখ রয়েছে- 'আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তুলে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের গণপরিষদ আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।' প্রসঙ্গত , সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি ১৯৭৬ সালে সংযোজন করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের মূল কপি লেখা হয় ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। ইংরেজি কপির ক্যালিগ্রাফার ছিলেন প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা। হিন্দি ক্যালিগ্রাফি করেন বসন্ত কুমার বৈদ্য। প্রস্তাবনা পৃষ্ঠার নকশা তৈরি করেন বিহার রাম মনোহর সিনহা এবং জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ অঙ্কন করেন দীননাথ ভার্গব। সংবিধানের প্রতিটি অংশের প্রারম্ভে একটি করে চিত্রকর্ম রয়েছে। চিত্রকর্মগুলো সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে চিত্রিত করে। চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ১. মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার, ২. বৈদিক যুগের গুরুকুল ব্যবস্থা, ৩. রামায়ণের দৃশ্য, ৪. মহাভারতের দৃশ্য, ৫. গৌতম বুদ্ধ, ৬. ভগবান মহাবীর, ৭. সম্রাট অশোক, ৮. গুপ্ত আমলের শিল্প, ৯. বিক্রমাদিত্যের রাজসভা, ১০. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১. রাজা ভরত, ১২. নটরাজের মূর্তি, ১৩. ভাগীরথের তপস্যা, ১৪. আকবরের দরবার, ১৫. ছত্রপতি শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিং, ১৬. রানী লক্ষ্মী বাঈ ও টিপু সুলতান, ১৭. মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান, ১৮. নোয়াখালীতে গান্ধীজি, ১৯. আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ২০. হিমালয়ের দৃশ্য, ২১. থর মরুভূমির দৃশ্য, ২২. ভারত মহাসাগরের দৃশ্য। চিত্রগুলো কল্পনা ও সম্পাদনা করেন নন্দলাল বসু ও তাঁর সহযোগী শিল্পীবৃন্দ।

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান তিন স্তম্ভ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে একটি ভারসাম্যযুক্ত এক্তিয়ার বণ্টন করে দিয়েছে। সাধারণত সেটা সবাই মেনে চলে। সংবিধানে দেশের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী মানুষের প্রতি মোটামুটিভাবে সমান দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়নি। আমাদের দেশের সুবৃহৎ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় জীবনের খুঁটিনাটি প্রায় সব বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

যেখানে বৈচিত্র্য যত বেশি সেখানে সমস্যা ও জটিলতাও তত বেশি। এব্যাপারে গোটা বিশ্বে আমাদের দেশের কোনো জুড়ি নেই। সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ আইন তথা সংবিধান পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সংবিধানে সেই সংস্থান রাখা রয়েছে। সংবিধানের ৮০ শতাংশ ধারা সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়। কিন্তু ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ১০৬ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের দেশে সংবিধান সংশোধনের প্রবণতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি। ১৭৮৯ সালে প্রবর্তনের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে মাত্র ২৭ বার।

সম্প্রতি ভারতের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্মকাণ্ডে একটা গুরুতর অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার মতন ইতিবাচক গুণাবলী অপসৃত হতে দেখা যাচ্ছে। বহুত্ববাদের বদলে একত্ববাদ বা সর্বগ্রাসীবাদের উত্থান ঘটছে। গণতন্ত্রের অঙ্গনে একনায়কতন্ত্র পুষ্ট হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিপক্ষ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সংবিধানের ফাঁকফোকর ব্যবহার করেই সংবিধান বিরোধী কাজ করা হচ্ছে। আসলে সরকার আর সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা ছাড়া সংবিধানের স্পিরিটকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

এলোমেলো কথা

বাংলাদেশে বাউল ও ফকিরদের ওপর আক্রমণ কে ধিক্কার

শুভ বসু

আমাদের ছোট বেলায় আমাদের বন্ধু শুভেন্দুর বাবা পূর্ণদাস বাউল কলকাতা থেকে এসে আমাদের গান শুনিয়েছিলেন ছাত্রাবাসের বারান্দায়।সে যুগে পূর্ণদাস বাউল ছিলেন বাংলার সংস্কৃতির এক অনন্য ব্যক্তি। আর ছিলেন সনাতন দাস বাউল। আরো পরে নাম

করলেন পবন দাস বাউল। আমার কৈশোরে পৌষ মেলায় এক বিস্ময়ের বিষয় ছিল বাউলদের গান , মুর্শিদী গান , জারি গান , আলকাপ, ফকিরদের গান , রায়বেঁশে নাচ যা ছিল বাঙালির লোক সংস্কৃতির সম্পদ। শান্তিনিকেতনে তখন লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ মশাই। তিনি অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে এই সংগীতগুলি পরিচালনা করতেন।

পাঠভবনে সেই সময় আমি গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে এসে পড়েছিলাম শচীন অধিকারীর ' শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ।' তাঁর সন্তান সোমেন অধিকারী বিশ্বভারতীর কর্মী ছিলেন। সেই গ্রন্থ থেকে আমি শিলাইদহে পদ্মা এবং গড়াই নদীর তীরের উন্মুক্ত প্রকৃতির কথা পড়ি। সেই বিশাল পদ্মা নদী তার ঘূর্ণি প্রবাহ এবং তার পারে মানুষের লোকজ সংস্কৃতির কথা আমার মনে গেঁথে যায়। সেই শিলাদহ অঞ্চলের ডাকঘরের কর্মী ছিলেন গগন চন্দ্র দাস যিনি গগন হরকরা নাম পরিচিত ছিলেন। তাঁর গানের সুর এবং কথা রবীন্দ্রনাথ কে মুগ্ধ করেছিল। কথিত আছে আমার সোনার বাংলা গানখানির সুরে গগন হরকরার গানের প্রভাব রয়েছে। রবীন্দ্র গীতি নাট্যে বাউলের একটি ভূমিকা রয়েছে। অন্ধ বাউলের কথা তাঁর সাহিত্য আবার বার বার ফেরত এসেছে।

পরে আমি ক্যামব্রিজে পড়ার সময়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয় Jeanne Openshaw র সঙ্গে । তিনি তখন বাউলদের উপরে গবেষণা করছেন। তাঁর গ্রন্থ ' সিকিং বাউলস অফ বেঙ্গল ' পড়ার সৌভাগ্য হয় আমার। Jeanne বহুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেই সময় থেকে আমি ঘনিষ্ট আকর্ষণ বোধ করি লালনের সংগীতে । লালন কোন ধর্মর মানুষ ছিলেন জানা যায় না। কেউ বলেন তিনি ছিলেন কাজী দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান এর সন্তান। আবার কেউ বলে তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর নাকি সাক্ষাৎ ধর্মগুরু ছিলেন সিরাজ সাই। তাঁর লেখা গান আমার একান্ত প্রিয়। ভারতবর্ষে চৈতন্য, নানক , কবির , দাদু , নামদেব , জ্ঞানদেব প্রভৃতি সাধকের মাধ্যমে লোক সংস্কৃতির যে ভক্তি পরম্পরা চলে এসেছে লালন সাই সেই পরপম্পরার মানুষ।

বাংলায় লোক সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমিলিত ধারা প্রবাহিত হয় যার মধ্যে এক গভীর দার্শনিক প্রত্যয় রয়েছে। বাঙালির কবি নজরুলের মধ্যে যে সহজাত ভাবে এক উদার মানবিক অসাম্প্রদায়িক চিন্তা দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তার সূত্র কিন্তু নজরুলের লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজাত সম্পর্কে। এক সাহসী বিপ্লবের কবি , সুফী ইসলামের কবি , হিন্দু ধর্মর শ্যামা সংগীতের করি আবার বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমানি ধারার কবি হিসাবে নজরুলের পরিচিতি রয়েছে। আমি যদিও তাঁকে প্রেমের কবি বলে জানি। রিচার্ড ইটনের বই পরে আমি বাংলার মধ্যে ইসলামের প্রচার সম্পর্কে জেনেছি যে কিভাবে কৃষির সম্প্রসারণের সঙ্গে নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলায় সুফী খানকা বা পীরের মাজার থেকে ইসলামের বিকাশ। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম যে তরবারির জোরে বাংলায় আসে নি একথা স্বীকৃত। কারণ দিল্লি আগ্রার আশেপাশে ইসলাম বিকশিত হয় নি কিন্তু বাংলায় হয়েছে । বাংলার মধ্যে, যেখানে লোকজ ধর্মর উপস্থিতি ছিল কিন্তু কোনো শক্তিশালী বৈদিক ধর্ম ছিল না , সেখানে ইসলামের সূচনা হয় পীরের মাজার থেকে। বাংলায় পীরবাদ নিয়ে আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের সূত্র থেকে সমালোচনা করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লাল সালু উপন্যাসে। এটি এক অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতার মুহূর্তে সেই সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক বুদ্ধিজীবী হিসাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পীরবাদের আধুনিকতার দিক থেকে সমালোচনা করেন। পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হন কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

যাই হোক পীরবাদের এবং লোকজ সুফী ধারণার এক অদ্ভুত বৈচিত্রময় প্রভাব রয়েছে গ্রামীণ বাঙালি জীবনে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে নিজস্ব গান , মেলা উৎসবের মধ্যে দিয়ে পীর মুরিদ সম্পর্ক এক অদ্ভুত রঙিন জীবনের সূচনা করেছে গ্রাম বাংলায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক লড়াই শুরু হয়েছে পীর পন্থী এবং বাউল ফকির লোকজ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। বাংলায় সালাফিবাদ হল সুন্নি ইসলামের মধ্যে একটি মৌলবাদী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন যা প্রাচীন ইসলামের খাঁটি রীতিনীতি, যা সালাফ নামে পরিচিত, সেগুলোতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে সমর্থন করে। এটি কুরআন ও হাদিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা, করে এবং সুফি রহস্যবাদের কিছু রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করে । আজ, এটি একটি বৈচিত্র্যময় আন্দোলন যা বিস্তৃতভাবে নীরবতাবাদী, কর্মী এবং জিহাদী ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে ।কিন্তু বর্তমানে সেই সালাফীপন্থীদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং বাংলাদেশে নানা আগ্রাসী মৌলবাদী ধারার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বাউল, পীর এবং সুফী ধারার বিরুদ্ধে. হিংসাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছেন। অথচ ১৯৪০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি যখন বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তখন পাকিস্তান পন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা দাবি করতেন যে তাঁরা আয়ারল্যান্ড এর মতো বাংলায় লোকজ সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করবেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচিতি হলো বাউলগান , লালন সংগীত , ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, এবং গম্ভীরা

সংগীতের ধারা। সেই সঙ্গে রয়েছে জারি , সারি , পল্লী গীতি , এবং হাসন রাজার ভক্তি গীতি। আজকের বাংলাদেশ যদি লালন , নজরুল বা আব্বাস উদ্দিনকে বাদ দিয়ে সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের পথে হাঁটে তাহলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের সংকট হবে। কিন্তু আমার বিস্ময় জাগে যাঁরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির পুরোধা হিসাবে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন তাঁরা মুখবই অর্থাদ্ভত্ন এ বাউলদের উপর আক্রমণের কোনো প্রতিবাদ করেন না। আমার মনে হয় পাকিস্তানের মৌলিক চিন্তক জনাব চৌধুরী রহমত আলী তাঁর পাকিস্তান নামকরণের পর বুঝেছিলেন তিনি বাঙালিদের বাদ দিয়েছিলেন তখন তিনি বাংলা কে বলেন বঙ্গ ই ইসলামিস্তান। বাংলাদেশ কি তার নাম পাল্টে এবার বঙ্গ ই ইসলামিস্তানে পরিণত হবে ? আমার বাংলাদেশ প্রিয় দেশ কিন্তু বঙ্গ ই ইসলামিস্তান কে আমি চিনি না। তাই পীরের মাজার , এবং বাউলদের উপর আক্রমণ লালন আর নজরুল নাম নিয়ে লালনের অনুগামীদের উপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করি। সেই সঙ্গে স্মরণ করি লালনের সেই গান—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
কেউ মালা, কেউ তসবিহ গলে,
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে।
কেউ মালা, কেউ তসবিহ গলে,
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে।
আসা কিংবা যাওয়ার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কারে।।
জগৎ জুড়ে জাতের কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা।
লালন বলে জাতের ফাতা
ডুবাইছি সাধবাজারে।।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

পরিবেশ ভাবনা

প্রযুক্তি, জনসংখ্যা ও পরিবেশ নিয়ে কিছু ভাবনা

সিদ্ধার্থ সেন

কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে বেশ নাড়া খেলাম। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৪শে অগাস্ট (৭ই ভাদ্র) ২০২৫, রবিবারে। লিখেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী। লেখাটির শিরোনাম 'চুল ভিজাব না ?' বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য শিরোনামের উপরে লিখেছেন 'মানুষের আয়ু -অভিলাষ ও পরিবেশচিন্তায় একটি প্রচ্ছন্ন সংকট'। দীপেশবাবু সুলেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর প্রবন্ধেটিও সুন্দরভাবে শুরু হয়, 'সময়-সময় আমাদের অনেকেরই মনে হয় যে এমন একটা ব্যবস্থা বা 'সিস্টেমের' মধ্যে আটকে পড়েছি, এবং নিজের ইচ্ছে স্বার্থবুদ্ধির বশে জড়িয়েও গেছি, যে ব্যবস্থাটাই আমাদেরই বিচারে আমাদের সমগ্র ভবিষ্যতের জন্য ভাল নয়'।

তাঁর লেখার মূল প্রতিপাদ্য হল, আজকের দিনে মানুষ এখন অনেক দিন ধরে বেঁচে থাকে। অষ্টাদশ শতকে মানুষের গড় আয়ু ছিল তিরিশের নিচে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ দিয়ে সেই গড় আয়ু গিয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশের নিচে। আর এখন তো আকছার পঁচাশি বা নব্বই বছরের মানুষ দেখা যায়। কোন কোন দেশে গড় আয়ু এখন আশি ছাড়িয়েছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে দেশের মানুষের গড় আয়ুকেই সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির মূল মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়। আয়ু বাড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১.৬ বিলিয়ন; সেটা ২০০০ সালে এসে দাঁড়ায় ৬ বিলিয়ন, বর্তমানে তা ৮ বিলিয়ন। বিশেষজ্ঞদের মতে আর কয়েক দশক পরে তা ১০ বিলিয়নে গিয়ে স্থিতিশীল হবে। এটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে। বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক, বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। আবার এই বাড়তি লোকের খাদ্যের যোগান দিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের সহায়তায়, না হলে পৃথিবীর অর্ধেক লোকই আজ অনাহারে মারা যেত। বস্তুতঃ এখন রাসায়নিক সার ছাড়া চাষবাসের কথা ভাবা যায় না। সেই সাথে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাছ চাষ হচ্ছে, ব্রয়লার মুরগি হচ্ছে, জার্সি গরুর দুধ হচ্ছে। কিন্তু এই যোগান দিতে আমরা পরিবেশকে দূষিত করছি। এটা কি একটা ফ্যালাসি নয় ? অর্থাৎ ওঁর

মতে, একদিকে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি করে মানুষকে নব্বই বছর পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখছি, কিন্তু তা করতে গিয়ে আবার পরিবেশের সর্বনাশ করছি। একই সাথে আমরা পরিবেশ বাঁচাও বলে বড় বড় কথা বলছি। মূলত এই বক্তব্যই কিছু প্রশ্ন আকারে তিনি রেখেছেন।

কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, ভাববার বিষয়। যদিও দীপেশবাবুর যুক্তি প্রায় অকাট্য, তবু তার মধ্যে কিছু ফাঁক আছে কিনা, বা তা অতিসরলীকরণের দোষে আক্রান্ত কিনা, সে প্রশ্ন থাকতেই পারে। সেইভাবেই বর্তমান লেখাটি উত্থাপন করতে চাই। তার সাথে কিছু বিকল্প ভাবনাও যোগ করা যায় কিনা তারও সন্ধান করা প্রয়োজন। উপরোক্ত লেখাটির দুটি বক্তব্য নিয়েই মূলতঃ এই আলোচনা সীমিত রাখতে চাই। প্রথম বক্তব্য, বিশেষ করে গত এক শতক ধরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, যেটা হয়তো বা এখন তার প্রাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতার সীমাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়তঃ, এটা করতে গিয়ে, মানুষকে কৃত্রিম ভাবে উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে, যেটি সঠিক পদ্ধতি নয়। আর এ থেকে জন্ম হচ্ছে এক পরিবেশ সংকট। এ নিয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন হলেও, তার মূল কারণটি, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা মানুষের আয়ু বাড়তে দেওয়াকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপরে অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ Malthus এক আলোড়নকারী তত্ত্ব দেন, যা Maltusian Theory বলে প্রচলিত। এতে তিনি বলেন যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে গুণিতক প্রগতি (Geometric Progression) তে, আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে সমান্তর প্রগতি (Arithmetic Progression) তে। আর একদিন এর ফলে গুরুতর খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হবে। মনে রাখতে হবে, ওই সময়ে মানুষের গড় আয়ু ছিল তিরিশের নিচে, লোক সংখ্যাও অনেক কম। পরবর্তীকালে Malthus এর এই তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়। কারণ দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে ট্র্যাক্টর ইত্যাদি অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে কৃষি উৎপাদন অনেকগুন বাড়ানো গেছে। কাজেই কৃষি উৎপাদনের সমান্তর প্রগতির যে তত্ত্ব Malthus সাহেব দিয়েছিলেন,সেটি ভুল। কৃষি উৎপাদন এতটাই বেড়েছে যে, আজকের দিনে তা দিয়ে আট বিলিয়ন লোককে স্বচ্ছন্দে খাওয়ানো যায়।

এর সাথে সাথেই হয়ত আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে: সে তো না হয় করলে বাপু, কিন্তু তার বিনিময়ে কি মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের? আগে ধান-গম চাষ হত প্রাকৃতিক উপায়ে, কোন রাসায়নিক সার তাতে দেওয়া হত না। আর আজকের দিনে রাসায়নিক সার ছাড়া যদি চাষ করা হয়, তবে উৎপন্ন শস্য দিয়ে সারা বছরের জন্য চাষির নিজের পেটের ভাতও হয়ত জুটবে না। আমরা আজকাল যা যা খাই, তা কোনো কিছুই প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি নয়। ব্রয়লার মুরগি বা জার্সি গরুর জন্ম হচ্ছে আজ কৃত্রিম পদ্ধতিতে, ল্যাবরেটরিতে। মাছের চাষও হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে। সেই সাথে আজকাল Genetically Modified বা GM বেগুন বা এই জাতীয় নানা সবজি পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, পোকা ধরে কম। কিন্তু এগুলির ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে উন্নত জাতের বীজ তৈরী করা, বা কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে উন্নত জাতের গবাদি পশুর চাষ কি এই শতাব্দীতেই প্রথম হচ্ছে, না আগেও হয়েছে ? মানব সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু কি বলে ?

প্রাচীন মানুষ আদি যুগে ছিল শিকারি-সংগ্রহকারক। চাষবাস তারা জানত না। গাছ থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে ও বিভিন্ন বন্যপ্রাণী শিকার করে তাদের খাদ্য সংস্থান হত। বহু হাজার বছর এই ভাবে চলার পর তারা চাষবাস করা শিখল। এটা কিন্তু একদিনে আকস্মিকভাবে হয় নি। এর পেছনে কাজ করেছে আদিম মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও নানা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রবণতা। কিভাবে? তৃণভূমি এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় লম্বা লম্বা জংলী ঘাস গজাতো ; তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতির ঘাস থেকে একরকমের বীজ পাওয়া যেত , যেগুলো খেতে বেশ সুস্বাদু , ক্ষিদেও মিটতো তাতে। আদিম মানুষ প্রথমে গাছটিকে চিনলো, তা থেকে আরও বেশি পরিমানে বীজ পাওয়ার জন্য কিছুটা জমি সমতল করে, সেখান থেকে আগাছা নির্মূল করল। তারপর কোন এক বৃষ্টিভেজা সকালে সেই গাছের কুড়োনো কিছু বীজ মাটিতে পুঁতে দিল, যাতে পাখিরা তা খেয়ে যেতে না পারে। ফল মিলল অচিরেই। তা থেকে চারা গজালো, গাছগুলি বড়ো হলো, ফলন হল অনেক বেশি। আবিষ্কার হল চাষ করার পদ্ধতি। কিন্তু ওই ঘাসগুলি জাতে ছিল জংলী। ফলন তাতে অত্যন্ত কম হত। শুরু হল নতুন প্রচেষ্টা। ভিন্ন জাতের ঘাসের বীজের পরাগরেণু মিলিয়ে চেষ্টা চললো উন্নতি প্রজাতির শস্য ফলাতে। বুনো ঘাস থেকে জন্মালো গম, বার্লি, বাজরা ইত্যাদি শস্য। চাষবাসের পদ্ধতিরও প্রমিতকরণ (standardization) হল।

চাষবাস রপ্ত করার সাথে সাথেই মানুষ শিখল গবাদি পশুপালন। সেটাও ছিল একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে বন্য জন্তুকে পোষ মানানো সহজ ছিল না। প্রথম কাজ ছিল কোন কোন জন্তুকে পোষ মানানো যেতে পারে তাদের বাছাই করা । সেই

সাথে তাদের পোষ মানানোর জন্য চললো নানারকম প্রশিক্ষণ। একই সাথে তাদের গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করার জন্য অনেক রকম ভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন করা হয়েছে। কাছাকাছি নানা প্রজাতির জন্তুদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে তাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাদের বশীকরণ করা সহজ। এইভাবে কয়েক পুরুষ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন বন্য জন্তুকে গৃহপালিত পশু হিসেবে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তারা টিকেও গেছে। আদিম গৃহপালিত গরু, মহিষ, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদির সাথে যদি তাদের বন্য পূর্বপুরুষের জিনের তুলনা করে দেখা হয়, তবে দেখা যাবে সেই জিনের অনেকখানি পরিবর্তন করানো হয়েছে নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে আজকের দিনে কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে ব্রয়লার মুরগির মাংস, জার্সি গরুর দুধ খেতে আপত্তি কোথায়?

এবার আসি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে। একথা অনস্বীকার্য যে গত এক শতকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। আর তার ফলে শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু যেমন কমেছে, তেমনি মহামারীর প্রকোপও কমেছে অনেক। এর সাথে নানারকম জীবনদায়ী ওষুধ ও রোগনির্ণয়ের নানা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে মৃত্যুমুখী বহু মানুষকে আজকাল বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। তাই আশেপাশে নব্বই-একশো বছর বয়স্ক মানুষের দেখা পাওয়া দুর্লভ নয়। শুধু তাই নয়, অনেক জটিল ও জন্মগত রোগ, যা থেকে রোগীর কোনোভাবেই একটা বয়সের পরে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, জিন থেরাপির সাহায্যে আজকাল সেই সব রুগীকেও সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। এটা সম্ভব হচ্ছে তার শরীরের ডি এন এ র ত্রুটিপূর্ণ অংশটি অতি সুক্ষ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে সেই জায়গায় কোন সুস্থ ডি এন এ র কিছু অংশ কেটে জোড়া দিয়ে। অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ এমন জায়গায় চলে গিয়েছে যে, ঠিক ভাবে চিকিৎসা করলে মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুও আজকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় অনেক দিন।

কিন্তু এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এইভাবে আমরা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রকে খারিজ করে দিচ্ছি? কারণ এই সূত্র বলে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে কোনো নিদৃষ্ট প্রজাতির একমাত্র যোগ্যতম বংশধরই টিকে থাকে, বাকিরা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। তাহলে যার শরীরে জন্মগত কিছু খুঁত আছে; যার পক্ষে নিজের খাওয়া, পড়া, বাঁচার সঙ্গতি জোগাড় করা সম্ভব নয়; যার এতদিন পর্য্যন্ত জন্মের কিছুদিন পরেই মরে যাবার কথা, তাকে সুশ্রষা করে, আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তার জীবন প্রলম্বিত করা অর্থহীন নয় কি? দীপেশবাবুর প্রবন্ধের বক্তব্যের রেশ টেনে কেউ হয়তো এও প্রশ্ন করতে পারেনা যে , যারা বৃদ্ধ, অশক্ত, যাদের নিজেদের খেটে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের বাঁচিয়ে রেখে আমরা কি শুধু শুধু প্রকৃতির সীমিত রসদের অপচয় করছি না ?

অন্যভাবে এই প্রশ্নের আর একটা উত্তর খোঁজা যাক। ডারউইনের সূত্রের বেঁচে থাকার লড়াইকে যদি আমরা প্রতিযোগিতামূলক বলে আখ্যা দিই , তবে সমাজজীবনের আরও একটি দিকও পাশাপাশি আছে, সেটি সহযোগিতামূলক। আর জীবজগতের এই প্রবৃত্তিটিকে কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন সমাজজীবন গড়ে উঠেছে। তাতে পরস্পরকে সাহায্য করা, অন্যের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিই হল মূল চালিকাশক্তি। এটা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি নানা প্রজাতির মধ্যেই দেখা গেছে। তাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এরা এমন কিছু কাজ করে বসে যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তা কল্পনাও করা মুশকিল। একটি পিঁপড়ের বাসা বা মৌমাছির মৌচাক গভীর ভাবে করলেই তা বোঝা যাবে। মানুষের ক্ষেত্রেও এরকম উদহারণ দেওয়া শক্ত নয়। প্রাচীন মানুষের ইতিহাস খুঁজলেও দেখা যাবে, এমন অনেক সৌধ বা স্থাপত্য খুঁজে পাওয়া গেছে, যা সেই সময়ের মানুষের বৈজ্ঞানিক বা কারিগরির জ্ঞানের অবস্থানের সাথে তুলনা করলে কি করে বানানো সম্ভব হল ভাবতে অবাক লাগে।

কাজেই শেষ করার আগে এই কথাটাই বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রকে অনেকটাই প্রসারিত করতে পারে। অবশ্য, এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন।

(লেখক আই.আই.টি, খড়্গপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক)

জলবায়ু সম্মেলন-৩০
উষ্ণায়ন হ্রাসে সমাধান অধরা

রাহুল রায়

কথামুখ

ব্রাজিলের আমাজন বৃষ্টিবনের ধারে অবস্থিত বেলেম শহরে রাষ্ট্রসংঘের সিওপি ৩০ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে সরকারি কূটনীতিক, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য-সদস্যা, পরিবেশকর্মী এবং শিক্ষাবিদরা মিলে কয়েক হাজার জন উপস্থিত হয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়সীমা (১০-২১ নভেম্বর, ২০২৫) পেরিয়েও এই সম্মেলন চলেছিল পরের দিন মাঝরাত অব্দি।

এই সম্মেলন এমন একটি জায়গা, যেখানে দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন-এর নানান কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাববে। প্রকৃতি অনুসারে জলবায়ু চুক্তি বিতর্কিত এবং আলোচনা মুখর। এটি বিশ্বকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, যেসব দেশ বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের সঞ্চয়ে সবচেয়ে বেশি দায়ী, নির্গমন কমাতে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্বও তাদের এবং অন্য সব দেশ, যাদের উন্নয়নের জন্য এখনও নির্গমনের প্রয়োজন বলে তা করতেই হবে। এই বিভেদের প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে দেশগুলি সহমত হয়ে জানিয়েছিল, প্রশমণ লক্ষ্যমাত্রা অতীত নির্গমনকে প্রতিফলিত করবে এবং উন্নতিশীল দেশগুলির ভিন্ন বিকাশের জন্য তাদের আর্থিক ও প্রাযুক্তিক সহায়তা করা হবে।

কিন্তু সিওপি-৩০ অবদি বিগত ৩০ বছরে বিশ্বের দেশগুলি এই বিষয়ে চরম গড়িমসি করেছে। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি ন্যায্যতার নীতি মুছে ফেলেছিল যা খুবই খারাপ। প্রতিটি দেশ এখন তাদের নিজস্ব জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contribution বা এনডিসি) লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে (যদিও কিছু পার্থক্য আছে)। এর ফলে আবিশ্ব বিধি ভিত্তিক ব্যবস্থাটি পূর্ণতা পায়নি। ১৯৯২ সালে 'দূষণকারী নয়'; তালিকায় থাকা অনেক দেশই এখন দূষণকারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর জন্য চুক্তিটি সংশোধনের দরকার ছিল। দরকার ছিল এক সর্বসম্মত সূত্রের, যেখানে অতীত এবং বর্তমান নির্গমনের ওপর ভিত্তি করে এক সূচক তৈরির, যা দেশগুলির বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করবে। এখন যখন পৃথিবীর দক্ষিণের দেশগুলির বিকাশের প্রয়োজন, যারা বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে খুব কম অবদান রেখেছে, তারা যখন অর্থায়ন বা প্রযুক্তি হস্তান্তর দাবি করছে, সেটাকে অনৈতিক বলে তাদের বৈধ দাবি খারিজ করা হয়।

প্রতিটি জলবায়ু সম্মেলনে একটি করে নতুন পরিকল্পনা আলোচিত হয়, যেমন 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' (সিওপি-২৭), 'নিউকালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়েড গোল অন ক্লাইমেট ফিনান্স' (সিওপি-২৯) বা 'গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপ্টেশন' (সিওপি-৩০)। প্রতিবারই নতুন প্রক্রিয়া এবং নতুন অর্থায়নের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু জলবায়ু অর্থায়নের নামে যেটুকু মেলে, তা হল ঋণ, যা ঋণের বোঝাই বাড়ায়। এই বছর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা যা পেয়েছে, তারচেয়ে সুদের টাকা বেশি গুনেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাব মোকাবিলায় অপারগতা এবং দেশের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। দিগন্তে সিঁদুরে মেঘ রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিবেদন জানিয়েছে, আবিশ্ব গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন অবিরাম বাড়ছে। ২০২৪ সালে এটি ৫৭.৭ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইডসমতুল (GtCO2e) বেড়েছে। এই বৃদ্ধি আগের বছরের তুলনায় ২.৩ শতাংশ বেশি এবং ২০১০-এর দশকের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের চারগুণেরওবেশি। ২০৩০ সালের গোড়ায় ভূ-উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার চৌকাঠ পেরোবে। এটি একটি অত্যন্ত খারাপ খবর। কারণ, ভূ-উষ্ণায়ন ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার পরে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বিপর্যয়কর চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা-র (ডাব্লিউএমও) 'স্টেট অফ গ্লোবাল ক্লাইমেট আপডেট ২০২৫' প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বায়ুমণ্ডলে তিনটি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাসঅক্সাইড) ঘনত্ব ২০২৪ সালে পর্যবেক্ষণাধীন নথিভুক্ত সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর ঘনত্ব ১৭৫০ সালের ২৭৮ পিপিএম থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ৪২৩.৯ হয়েছে (৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি)। ২০২৩-২০২৪ সালেএই ঘনত্বের বৃদ্ধি ছিল ৩.৫ পিপিএম, যা সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে একটি নজির বিশেষ। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, ২০২৫ সালে এটি আরও বাড়বে।

ডাব্লিউএমও প্রতিবেদন চেতাবনি দিয়েছে, ২০২৫ সাল নথিভুক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় সর্বোচ্চ উষ্ণতম বছর হতে চলেছে। বিগত ১৭৬ বছরের নথিভুক্ত পর্যবেক্ষণের মধ্যে ২০১৫-২০২৫ সাল, এই ১১ বছর ১১টি উষ্ণতম বছরের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে বিগত ৩ বছর ছিল উষ্ণতম। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, জুন ২০২৩ থেকে অগাস্ট ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৬ মাসে রেকর্ড ভাঙা মাসিক তাপমাত্রা ধারাবাহিক ভাবে বেড়েছে (ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বাদে)।

সমুদ্রতাপের পরিমাণ ২০২৪ সালের রেকর্ড স্তরের ওপরে ক্রমাগত বাড়ছে। গত দুই দশক ধরে সমুদ্রের উষ্ণতা ত্বরান্বিত হচ্ছে। এসবের পরিণতি সুদূরপ্রসারী; সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং সমুদ্রের কার্বন শোষণ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়া। উষ্ণ সমুদ্র শক্তিশালী ঝড়ের মদত দিচ্ছে। মেরুতে সমুদ্রের বরফ বিগলনের গতি বাড়াচ্ছে। স্থলভাগের বরফ হ্রাসের সাথে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে। সমুদ্রতলের বৃদ্ধির হার ১৯৯৩-২০০২ সালের মধ্যে বার্ষিক ২.১ মি.মি থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৬-২০২৫ সালের মধ্যে বার্ষিক ৪.১ মি.মি হয়েছে। শীতকালীন বরফ জমার পর সুমেরু সাগরের বরফের পরিমাণ নথিভুক্ত সর্বনিম্ন ছিল। কুমেরু সাগরের বরফের পরিমাণও সারা বছর ধরে গড়ের

অনেক কম ছিল। ডাব্লিউএমও প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ১৯৫০ সালের পর বিশ্বের সমস্ত পর্যবেক্ষণাধীন হিমবাহ অঞ্চলগুলি বহরে রেকর্ড পরিমাণ কমেছে, যা বিশ্বজুড়ে সমুদ্রতলের ১.২ মি.মি গড় উচ্চতা বৃদ্ধির সমান। ২০২৫ সালে আবহাওয়া জনিত চরম ঘটনাগুলির প্রভাবে আফ্রিকা ও এশিয়া জুড়ে বন্যা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উত্তর আমেরিকায় দাবানল, মারাত্মক ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং আবিশ্ব অবিরাম তাপদাহের সৃষ্টি হয়েছে।

১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যপূরণ আদৌ সম্ভব?

২০২৫-এ প্যারিস চুক্তির এক দশক পূর্ণ হল, যার লক্ষ্য ছিল ভূ-উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমিত রাখা এবং ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা করা। চুক্তি অনুযায়ী দেশগুলিকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন জলবায়ু প্রতিশ্রুতি (পরবর্তী ধাপের এনডিসি) জমা দিতে হবে। অনেকেই আশা করেছিলেন, এটি নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু সংকটের তীব্রতা এড়াতে একটি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখনও এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলেও ২০৩৫ সালে ২০১৯ সালের তুলনায় প্রত্যাশিত নির্গমন মাত্র ১৫ শতাংশ কমবে। ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ভূ-উষ্ণায়ন কমাতে হলে নির্গমন ৫৫ শতাংশ কমাতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ দেশই তাদের ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করতে পারছে না। ইউএনইপি প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, সবচেয়ে আশাপ্রদ পরিস্থিতিতে, ঘোষিত নেট-শূন্য নির্গমনে পৌঁছাতে সকল রাষ্ট্রের মিলিত এনডিসি প্রতিশ্রুতি পালনের পরেও এই শতাব্দে এখনও প্রায় ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ভূ-উষ্ণায়ন হবে (এই স্তরের নিচে থাকার সম্ভাবনা ৬৬ শতাংশ)।

বিগত ১৬ বছর ধরে ইউএনইপি আবিশ্ব 'নির্গমন ফারাক' (এমিশনগ্যাপ)-এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকাশ করে আসছে। এটি দেশগুলির ঘোষিত জাতীয় নীতি এবং প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আবিশ্ব নির্গমন কোথায় ফলপ্রসূ হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক তাপমাত্রার লক্ষ্যপূরণের জন্য কী প্রয়োজন; সেই পার্থক্য তুলে ধরে। এই বছরের 'অফ-টার্গেট' শিরোনামের এমিশন গ্যাপ রিপোর্ট-এ দেখা গিয়েছে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রোধে রাষ্ট্রগুলি তাদের এনডিসি লক্ষ্য পূরণের পথে নেই। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তির ১৯৩টি দেশের মধ্যে মাত্র ৬৪টি দেশ, যারা আবিশ্ব নির্গমনের ৬৩ শতাংশেরঅংশীদার, নতুন এনডিসি জমা দিয়েছে বা ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম-এর (ইউএনইপি) একটি প্রতিবেদন জানিয়েছে, বর্তমানে যেসব প্রকল্প ও নীতি হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে ২১০০ সালের মধ্যে ভূ-উষ্ণায়ন ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর দিকে এগোচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ এবং তার জনসংখ্যা অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। বিপুল জনসংখ্যা এবং দীর্ঘ উপকূলরেখা সহ ভারত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শক্তি উৎপাদন, সিমেন্ট, ধাতু ও অন্যান্য শিল্পে কয়লা, তেল ও গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে মোট নির্গমনের ৬৯ শতাংশ বাতাসে মেশে। বনভূমি কাটা এবং ভূমি-ব্যবহারের পরিবর্তনেও নির্গমন বাড়ে। ২০২৩-২০২৪ সালে ভূমি-ব্যবহারের পরিবর্তনে নেট কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ২১ শতাংশ বেড়েছে। তুলনায় একই সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ১.১ শতাংশ বেড়েছে। ইউএনইপি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ছয়টি বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাসনির্গমনকারী দেশ হল চিন, আমেরিকা, ভারত, ইওরোপিয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। ২০২৩-২৪ সালে ভারত ও চিন বাতাসে রেকর্ড পরিমাণ নির্গমন করেছে। একমাত্র ইওরোপিয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর নির্গমন কমেছে। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনটিতে দেখা যাচ্ছে, ভূমি-ব্যবহারের পরিবর্তনজনিত নির্গমন বাদ দিলে ২০২৩-২৪ সালে মোট নির্গমন বৃদ্ধির ৭৭ শতাংশই ছিল জি২০ দেশগুলির (আফ্রিকান ইউনিয়ন বাদে) নির্গমন। অন্যদিকে, 'একেবারে স্বল্পোন্নত দেশ'গুলি এই বৃদ্ধির মাত্র ৩ শতাংশের অংশীদার। সাতটি জি-২০ সদস্য নতুন এনডিসি জমা দিলেও এই গোষ্ঠীটি ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

আর্থিক সমস্যা

স্পষ্টতই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। কিন্তু সিওপি৩০-এর আগে ইউএনইপি যে 'অ্যাডাপ্টেশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৫' প্রকাশ করেছে, তা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। 'রানিং অন এম্পটি' শিরোনামের প্রতিবেদনটি জানাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক ৩১০-৩৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে ইতিমধ্যেই দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে, যেমন- ঘন ঘন চরম বৃষ্টিপাত, সুতীব্র ক্রান্তীয়ঘূর্ণিঝড়, হড়পাবান, ভূমিধস এবং তাপপ্রবাহ। দীর্ঘস্থায়ী খরা, সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং হিমবাহ ও বরফের চাদর গলে যাওয়ার মতো ধীরগতির বিপদের সাথেও তাদের লড়াই করতে হবে। এই অভিযোজনের জন্য আন্তর্জাতিক সর্বজনীন অর্থায়ন ২০২২ সালের ২৮ বিলিয়ন ডলার

থেকে ২০২৩ সালে উদ্বেগজনক ভাবে ২৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এর ফলে অভিযোজন-অর্থায়নের ঘাটতি ২৮৪-৩৩৯ বিলিয়ন ডলার হয়ে গিয়েছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অনুযায়ী২ ০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন-অর্থায়ন দ্বিগুণ করে ৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হবে না বলে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে। বাকু-তে (সিওপি২৯) জলবায়ু অর্থায়নের জন্য উন্নত দেশগুলিকে ২০৩৫ সালের মধ্যে জলবায়ু কর্মকাণ্ডের জন্য বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা হয়েছিল, যদিও অভিযোজন ব্যবধান পূরণের জন্য প্রয়োজনের তুলনায়এটি কম। ইউএনইপি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইঙ্গার অ্যান্ডারসেন বলেন, 'অভিযোজন-অর্থায়ন বাড়াতে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির ঋণের বোঝা না বাড়িয়ে আমাদের বিশ্বজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি দুটি উৎসকেই চাপ দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি এখনই অভিযোজনে বিনিয়োগ না করি, তাহলে খরচ কেবলই বাড়বে।' এখন উন্নয়নশীল দেশগুলির বর্তমান অর্থায়নের তুলনায় ১২-১৪ গুণ বেশি তহবিলের প্রয়োজন। পূর্ব অনুমানে ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই প্রয়োজন বার্ষিক ১৯৪-৩৬৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, 'অভিযোজন কোনও অর্থব্যয় নয়; এটি একটি জীবনরেখা। আবিশ্ব অভিযোজনের ব্যবধান পূরণ করে আমরা জীবন রক্ষা করি, জলবায়ু ন্যায় প্রদান করি এবং একটি নিরাপদ, আরও টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলি। আসুন, আমরা আর একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না করি।'

অর্থায়ন ও আগামী রোডম্যাপ

ধনী দেশগুলি কীভাবে এবং কতটা পরিমাণে গরিব দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেবে বা জীবাশ্ম-জ্বালানি থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য অর্থসাহায্য করবে, তা সিওপি ৩০-এর মূল বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধের জন্য একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ-এর আহ্বান ব্রাজিল এবং অন্যান্য দেশের সমর্থনে সম্মেলনে গতি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি থেকে দু'বার সরার পরেও এশিয়া জুড়ে বাণিজ্য আলোচনায় তেল ও গ্যাস বিক্রির ওপর জোর দিচ্ছে এবং বিরল খনিজ ক্রয়কে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন ইইউ-এর 'কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম' (১ জানুয়ারি থেকে কার্বন-নিবিড় পণ্য আমদানিকারকদের ওপর আরোপিত বাধ্যতা মূলক শুল্ক) জলবায়ু সহায়তায় দেরি বা অস্বীকারের কারণে ইতিমধ্যেই ক্ষুব্ধ দক্ষিণের দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার বিপদে ফেলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি জানিয়েছে, ইইউ-এর কার্বন মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার মতো একতরফা পদক্ষেপগুলি রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন-এর common but differentiated responsibilitie নীতি লঙ্ঘন করে জলবায়ু লক্ষ্য নির্ধারণে বাধা দেয়। ইইউ, মুক্ত বাণিজ্য আলোচনা চলা সত্ত্বেও, ভারতের কর অব্যাহতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারত-চিন শৈত্য

সিওপি-৩০ সম্মেলনে ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ কিছুটা গলার ফলে আশা জাগছে যে, এই দুই এশীয় শক্তিধর দেশ কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নির্মল-শক্তি সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে এমন এক মুহূর্তে, যখন পৃথিবীর দক্ষিণের দেশগুলি জলবায়ু-আলোচনায় সুবিধা খুঁজছে। চার বছর সম্পর্কের টানাপোড়েনের পর, সবুজ-শক্তির উপাদানগুলিতে নবীকৃত বাণিজ্য, আরও জলবায়ু-অর্থায়ন এবং ন্যায্য নিয়মের জন্য সিওপি৩০-এ তাদের ক্রমবর্ধমান যৌথ প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে। সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক টিভ্রাত গর্গ বলছেন, এই সমন্বয় আবিশ্ব শক্তির রূপান্তরকে সূক্ষ্মভাবে পুনর্বিন্যাস করতে পারে। ভারত এবং চিন-এর ক্রমবর্ধমান নির্মল-শক্তি বাণিজ্য এশিয়া-র কার্বন-মুক্ত করণের আগামী গতিপথ নির্ধারণের সম্ভাবনা রাখে। বাণিজ্যিক সম্পর্কের এই পুনরুজ্জীবন চিন-এর উৎপাদন-আধিপত্য এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান নির্মল-শক্তি চাহিদা; এই দুটির মিলনে কম খরচের কার্বন-মুক্তকরণের একটি আঞ্চলিক মডেল সৃষ্টি করবে, যা দক্ষিণের অন্য দেশগুলি গ্রহণ করতে পারে।

২০২৪ সালে ৬২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে চিন বিশ্বে নির্মল-শক্তি বিনিয়োগের শীর্ষে রয়েছে। এদিকে, ভারত জুলাই ২০২৫-এ তার স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতার অর্ধেক অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে তৈরির লক্ষ্যে পৌঁছেছে, ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার ৫ বছর আগেই। এখানে বলার, চিন ২০৬০ সালের মধ্যে নেট শূন্য নির্গমনে পৌঁছানোর লক্ষ্য রেখেছে। ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে তা করার পরিকল্পনা করছে। সিওপি ৩০-এ এই দুটি দেশ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহমত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত দেশগুলি যারা ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন প্রচেষ্টার জন্য তাদের অর্থায়ন-প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি। ভারত-চিন উভয়েই উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যএকতরফা বাণিজ্য ব্যবস্থা অন্যায্য এবং ক্ষতিকারক বলে এর বিরোধিতা করেছে।

চিন-এর অবস্থান

সিওপি ৩০-এ চিন নিজেকে 'নির্মল-প্রযুক্তি' সুপার পাওয়ার, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সহযোগী হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। বিগত ১০ বছরে দেশটির নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা ৩ গুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০২৪ সালে এটি ১,৮৭৬,৬৪৬ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালের তুলনায় সৌরশক্তি উৎপাদন বেড়েছে ২০ গুণ বেশি। বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী চিন ২০২৪ সালে নবায়নযোগ্য শক্তিতে ২৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লগ্নি করেছে যা ইইউ, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত মোট লগ্নির চেয়ে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। আবিশ্ব পরিবেশবান্ধব নেতৃত্ব দানে চিন নির্মল জ্বালানি সস্তা করে তার রপ্তানি অর্থনীতির বিকাশে আন্তর্জাতিক বাজারে সহজেই পা ফেলতে চাইছে। ২০১৮ সাল থেকে চিন বিশ্বজুড়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাটারি, সৌর যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং বায়ু-বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রপ্তানি করেছে। চিন তাদের এবং অন্য দেশগুলিকে নেট-শূন্য নির্গমনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাখতে চায়, যাতে তার নির্মল-প্রযুক্তি বাণিজ্য ফুলেফেঁপে ওঠে।

বেলেম প্যাকেজ

সিওপি-৩০ চূড়ান্ত পাঠ্য বেলেম প্যাকেজ 'গ্লোবাল মুটিরাও'-এ (global mutirao– মানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা) বেশ কিছু ঐচ্ছিক প্রতিশ্রুতি এবং কার্যকরী পদক্ষেপের কথা আছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জীবাশ্ম-জ্বালানি কমানোর স্বেচ্ছাকৃত পরিকল্পনা, নির্গমন কমাতে সমষ্টিগত কর্মসূচি বাড়ানো, ২০৩৫ সালের মধ্যে জলবায়ু অভিযোজন-অর্থায়ন তিনগুণ বৃদ্ধি করা, জলবায়ু প্রতিশ্রুতিগুলির গতিশীল রূপায়নে নানান ক্ষেত্রে (শক্তি, পরিবহন, খাদ্য, স্বাস্থ্য,শিল্পকারখানা,অর্থায়ন, ভূমি ও সাগর) বিভিন্ন কার্যসূচি নেওয়া। সম্মেলনে ব্রাজিল-এর রাষ্ট্রপতি নতুন এক 'বনভূমি তহবিল' চালু করে বননিধন পুরোপুরি শেষ করতে এক রোডম্যাপ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সিওপি-৩০ শুরুর আগে ব্রাজিল-এর 'ক্রান্তীয় বনভূমি তহবিল'-এ ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ওঠে। এই অর্থের অর্ধেকের বেশি দিয়েছে নরওয়ে ও জার্মানি। খাদ্য ও কৃষিতে জলবায়ু অভিযোজনের সূচকগুলির হদিশ রাখতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি সম্মত হয়। চূড়ান্ত মুটিরাও পাঠ্যে জীব বৈচিত্র্যধ্বংস ও জমির অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। জমির অধিকার রক্ষায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বেলেম প্যাকেজ-এর একটি মূল বিষয়ে ১৯৫টি অংশগ্রহণকারী দেশ সম্মত হয়েছে যে, প্যারিস চুক্তি কাজ করছে, তবে একে আরও দ্রুত আরও কিছু করতে হবে। 'এনডিসি সিন্থেসিস রিপোর্ট ২০২৫' অনুসারে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০৩৫ সালের মধ্যে ১২ শতাংশ নির্গমন হ্রাস এনডিসি-র কারণে সম্ভব, তবে 'ওভারশুট' হওয়ার ঝুঁকিও প্রথম বারের মতো আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১২২টি দেশ তাদের সাম্প্রতিকতম এনডিসি জমা দিয়েছে। দেশগুলি ভূ-উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে জলবায়ু-অভিযোজন ব্যবধান দূর করতে সম্মত হয়েছে। দেশগুলি 'বাকু-টু-বেলেম রোডম্যাপ ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার'-এও স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি সিওপি২৯-এগৃহীত এক সিদ্ধান্ত, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নকে বার্ষিক কমপক্ষে ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করবে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির এতে বর্ধিত প্রবেশাধিকারথাকবে।দেশগুলি ইতিমধ্যেই গৃহীত 'নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়েড গোল'-এর এক নতুন উপলক্ষ্যে সম্মত হয়েছে, যাতে ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অভিযোজনের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়ানো যায়।

অতঃকিম্

গ্লোবাল মুটিরাও বেশকিছু বিশ্লেষকের কাছে এক দুর্বল প্যাকেজ, কারণ এটি ঐচ্ছিক উদ্যমের ওপর বেশি নির্ভরশীল। ভূ-উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য যে শক্তিশালী বাধ্যবাধকতা পূর্ণ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল, যেমন; পর্যায়ক্রমিক বাধ্যতামূলক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে সরে আসা, স্বচ্ছ 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' অর্থায়ন ব্যবস্থা এবং আইনত বাধ্যতামূলক নতুন নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা; তা এতে নেই। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়ন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা বা নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার চালু করতে বেলেম ভরসা জোগালেও শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী এবং বিশেষত বিশ শতাব্দীর পর থেকে উষ্ণায়নের প্রধান উৎস জীবাশ্ম জ্বালানিকে কী ভাবে সরানো যায়, ৩০টি সিওপি-র পরেও তাতে একমত হওয়া যায়নি। ব্রাজিল ও তৎসহ বেশ কিছু দেশ জীবাশ্ম-জ্বালানি বাতিলে আপত্তি করেনি। কিন্তু কয়লা ও অশোধিত তেল উৎপাদক একাধিক শক্তিশালী দেশের চাপে বেলেম প্যাকেজ-এর মূল পাঠে 'জীবাশ্ম জ্বালানি' শব্দটি অনুপস্থিত, যদিও এটি গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি (২০২১) এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ঐকমত্যের (২০২৩) কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। শেষ

পর্যন্ত বিষয়টাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতার বাইরে ঐচ্ছিক পদক্ষেপ হিসেবে রাখা হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, সিওপি-৩০ ‘মানুষের সম্মেলন’-এর প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ, কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি আগ্রহটাই আলোচনায় কর্তৃত্ব করেছে। সম্মেলনে ৫০০০-এর বেশি দেশীয় জনগোষ্ঠীর কথাও শোনা হয়নি।

এখানে বলার, ভারতের বাণিজ্যিক প্রাথমিক শক্তির ৭৫-৮০ শতাংশ কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আসে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যুতের জোগানের সিংহভাগ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে মেলে। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। পরিবহন ক্ষেত্রটিও প্রচন্ড ভাবে খনিজ তেল-নির্ভর। ২০২৪ সালে আবিশ্ব প্রাথমিক শক্তির ৮০ শতাংশ এসেছে জীবাশ্ম-জ্বালানি পুড়িয়ে। বাকি ২০ শতাংশ শক্তি পাওয়া গিয়েছে পারমাণবিক ও নবীকরণ যোগ্য উৎস থেকে। পৃথিবীতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারই বেশি, বিশেষত এশিয়ায়। এ থেকেই বোঝা যায়, বেলেম প্যাকেজ-এর মূলপাঠে ‘জীবাশ্ম জ্বালানি’ শব্দটিতে বেশ কিছু দেশের কেন এত অ্যালার্জি। অর্থ বরাদ্দের আলোচনায় অবশ্য সকলেই সহমত হয়েছে যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে ৩০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার জোগাড় করতে হবে। তবে কীভাবে, স্পষ্ট করে কেউ খোলসা করেনি। আবার আমেরিকার অনুপস্থিতিতে এই অর্থ জোগাড় কতটা সফল হবে, সে প্রশ্নও থাকছে। যাইহোক, আগামী বছর সিওপি৩১-এ তুরস্ক এবং অস্ট্রেলিয়া জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কীভাবে কর্মসূচিগুলি এগিয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে।

তথ্যঋণ :

১।অ্যালেক্সলো : থ্রি রিজিনস্ হোয়াই চায়না ওয়ান্টস্ গ্লোবাল গ্রিন লিডারশিপ আফটার কপ থার্টি; অ্যান্ড টুরিজিমস্ ইট ডাজন্ট; দ্য কনভার্সেশন্, ২৮.১১.২৫।

২।বিমান মুখার্জি : অ্যাট কপ থার্টি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না অ্যালাইন অন ক্লাইমেট অ্যাজ টাইজ থ; দিস উইক ইন এশিয়া, ২৩.১১.২৫।

৩।ডাউন টু আর্থ, ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২৫।

৪।দ্য কপ থার্টি মুটিরা ও ডিসিশন অ্যান্ড হোয়াট ইট মিনস্থফর দ্য গ্লোবাল ফিনান্স সেক্টর; ইউএনইপি, ২৮.১১.২৫।ভোটার তালিকায়।ধ্যাপক)

নির্বাচন

বিহারে নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

সৌর বসু

এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচন প্রথম থেকে বিতর্কিত। বিহার নির্বাচনের সময় বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী কাজ শুরু হয়। যত বিপত্তি সেখানে। ভোটার তালিকা দেখা যায় প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ চলে গেছে।। বিরোধীপক্ষ প্রশ্ন তুললে নির্বাচন কমিশন তা অগ্রাহ্য করে। ভোটারদের, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড এবং আধার কার্ড কে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে ইলেকশন কমিশন। অথচ এতদিন অবধি ভোট দানের জন্য এই দুটি পরিচয় পত্র গ্রহণ করা হয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে বিরোধীপক্ষের,এই দুটি পরিচয় পত্র কে ভোটার তালিকায় নাম তোলার নথি হিসাবে গ্রহণ করার দাবি নির্বাচন কমিশন না মানায়, তাদের বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে হয়। বিচার ব্যবস্থা হস্তক্ষেপে সমস্যার আংশিক সমাধান হয়। সুপ্রিম কোর্ট বলে আধার কার্ড গ্রাহ্য হবে তবে একমাত্র নথি হিসেবে নয়। কিন্তু বিরোধীদের প্রভাবের এলাকা বেছে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়,এই সংখ্যা প্রায় ৮০(আশি) লক্ষ। যাদের মধ্যে বিরাট অংশ সংখ্যালঘু , দলিত ও দুর্বল শ্রেণির মানুষ। যাদের পক্ষে এই জটিল SIR form ভর্তি করা ও কাগজপত্র জোগাড় করা ছিল অসম্ভব । বিরোধীরাও অধিকাংশ জায়গায় পৌঁছাতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত মৃত ভোটার , স্থানত্যাগ ইত্যাদি বাদ দিয়েও প্রায় ৪৫ লক্ষাধিক ভোটার -এর নাম বাদ যায় ।যার মধ্যে ৩০ লাখ সংখ্যালঘু।

এবারে বিহারের নির্বাচনে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধী পক্ষ ক্ষুব্ধ ছিল। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না। এছাড়া এবারের বিহারের নির্বাচনে ভোটদানের হার বিগত নির্বাচনের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০২৫ সালে ভোটদানের হাট ৬৭.৪ শতাংশ। ২০২০ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই হাট ছিল ৫৭.৩ শতাংশ। অর্থাৎ ভোটদান আট দশ শতাংশ ২০২০ সালের নির্বাচন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে মহিলাদের ভোটদানের হার বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। ২০২০ সালের ৫৯.৬৯ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালে মহিলাদের ভোটদান ৭১.৬ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। মহিলাদের এই ভোট দান অভূতপূর্ব। ২০২৫ এর নির্বাচনে পুরুষদের ভোটদানের হার ছিল ৬২.৯৮ শতাংশ এবং মহিলাদের ভোট দানের হার ৭১.৬ শতাংশ। ২০২০ সালে পুরুষদের ভোট ছিল

৫৪.৬১শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ভোট দানের হার ৫৯.৬৯ বিগত লোকসভায় নির্বাচনে ২০২৪ সালে বিহারে পুরুষদের ভোটদানের হার ছিল ৫৩ শতাংশ এবং মহিলাদের ৫৯.৪৫ শতাংশ। ২০০৫ সালের নির্বাচনে মহিলাদের উপস্থিতি ভোটদানের ক্ষেত্রে মাত্র ৪৪.৬২ শতাংশে নেমে আসে।। ২০০৫ সালের পর থেকে বিহারের নির্বাচনে মহিলাদের ভোটদানের হার উপর্যুপরি ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এর কারণ হিসেবে নীতিশ কুমারের মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে বিহারে এনডিএ জোটের বিপুল জয় সম্ভব হয়েছে উন্নয়নের কারণে। কিন্তু তার এই বক্তব্যকে বিহারের যে উন্নয়নমূলক সূচক তা সমর্থন করে না। বিহারের জীবনযাত্রা মানের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বিহারের মাসিক মাথাপিছু ব্যয় শহর গুলিতে ৪৭৬৮ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৩৮৪ টাকা। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে রাজস্থানের শহর অঞ্চলের মাথাপিছু ব্যয় ৫৯১৩ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলের ৪২৬৩ টাকা। গুজরাটে শহরাঞ্চলে মাথাপিছু ব্যয় ৬৬২১ টাকা গ্রামাঞ্চলে ৩৭৯৮ টাকা। আবার উত্তরপ্রদেশে শহরাঞ্চলে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ৫০৪০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৩১৯১ টাকা। ভারতবর্ষে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় সংক্রান্ত সূচকে বিহার সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে।

বিহারে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে ব্যাপক দারিদ্র রয়েছে। আমরা যদি মজুরি স্তরের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো ২০২২ ২৩ সালে বিহারের গ্রামাঞ্চলের কৃষি শ্রমিক পুরুষের গড় দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ৩০৮ টাকা। সেখানে কেরালায় শ্রমিকদের প্রতিদিনের মজুরি ৭৬৪ টাকা , তামিলনাড়ুতে ৪৭০ টাকা। মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটে মজুরির পরিমাণ অবশ্য আরো খারাপ যথাক্রমে ২৪১ টাকা এবং ২২৯ টাকা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিহারের মান বেশ খারাপ। বিহারে সাক্ষরতার হার ৭৪.৩ শতাংশ। হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ঝাড়খন্ড ছত্তিশগড় রাজ্যগুলিতে এই হার যথাক্রমে ৮৪.৮ শতাংশ ৮২.৮ শতাংশ ৭৫.২শতাংশ,৭৫.৮শতাংশ, ৭৬.৭ শতাংশ,৭৮.৫ শতাংশ। অর্থাৎ বিহারের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খন্ডের শিক্ষার হার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বিহারের থেকে বেশি।

শুধুমাত্র ভারতের বৃহৎ রাজ্য গুলির মধ্যে অন্ধপ্রদেশের শিক্ষার হার বিহারের থেকেও কম। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিহার আমাদের দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত ভালো অবস্থানে নেই। শিশু মৃত্যুহার বিহারে প্রতি হাজার জনে ২৭জন। কেরালাতে ১০০০ জনে ৬ জন তামিলনাড়ুতে ১৩ জন এবং কর্ণাটকে ১৯ জন।

অতএব নরেন্দ্র মোদি যে বিহারে এনডিএ জোটের জয় লাভের জন্য বিহারের গতিশীল উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এন ডি এ এত বিপুলসংখ্যক আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে কেউ ভাবেনি। এক্সিট পোলেও এন.ডি.এ কে কোন সংবাদ মাধ্যম এত আসন দেয়নি। যদিও এক্সিট পোলে অনেকেই বলেছিল যে এবার এনডিএ সরকার গঠন করতে চলেছে। নীতিশ কুমার বিগত ২০০৫ সাল থেকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন।। মাঝে কিছুদিন জীতন রাম মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নীতিশ কুমার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। নীতিশ কুমার ক্ষমতায় অভিলাষ থেকে অনেকবার দল বদল করেছেন, সেজন্য তাকে পালটি বাবু বলেও উল্লেখ করা হয়। ২০১৫ সালে তিনি বিজেপি ছেড়ে আর জে ডি এবং কংগ্রেসের জোটে যোগদান করেন। ২ বছর বাদে তিনি পুনরায় কংগ্রেস এবং আরজেডি জোটকে ত্যাগ করেন। ২০২২ সালে তিনি বিজেপি জোট ত্যাগ করে আর জেডির সঙ্গে জোট বাঁধলেও ১৭ মাস পরে বিজেপির সঙ্গে পুনরায় হাত মেলান। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও নীতিশ কুমারের জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। নীতিশ কুমারের মহিলাদের মধ্যে আস্থা অর্জনের কারণ ২০০৫ সালের ক্ষমতা গ্রহণে পর পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ শুরু করেন । এরপর ২০১৬ সালে তিনি রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫শতাংশ কোটা ব্যবস্থা করেন।

২০২৪ সালের নীতিশ সরকার এই কোটা বিহারের বাসিন্দাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এছাড়াও রাজ্যব্যাপী মদ নিষিদ্ধ করার ফলে, নীতিশ সরকার মহিলাদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এবারে নির্বাচন ঘোষণা হবার পর নীতিশ সরকার ১ কোটি মহিলাদের জন্য সরাসরি ১০ হাজার টাকা নগদ অর্থ স্থানান্তরিত করেন। নির্বাচন শুরু হওয়ার পর এই পরিমাণ টাকা মহিলাদের একাউন্টে জমা পড়ে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের এতো বড় ঘটনা দেখেও নিশ্চুপ থাকে এছাড়াও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করা হয় জ্জ এটাও ছিল বিধি ভঙ্গ।

যাই হোক আমরা দেখেছি মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যপ্রদেশে, এ ধরনের মহিলা কল্যাণমূলক যোজনা নির্বাচনের আগে শুরু করার ফলে ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিহারের মহিলারা শিক্ষা, আয়ের ব্যাপারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

তৎ সত্বেও বিহারের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ তাদের এসেছে। কারণ দারিদ্রতার কারণে বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। সে কারণে গ্রামের পুরুষদের দেশান্তরী হতে হয়। গ্রামের মহিলারা তখন সাংসারিক কাজে এবং বাড়ির বাইরের কাজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতায়ন ঘটে।

নীতিশ সরকার কর্তৃক মহিলাদের এই সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে দেখা যাচ্ছে মহিলারা ৭১.৭৮ শতাংশ ভোট। দান করেছেন যেখানে পুরুষদের ভোট প্রদানের শতাংশ মাত্র ৬২.৮। এবারের নির্বাচনে এন ডি এ সরকারের অভূতপূর্ব ফলাফলের পিছনে মহিলাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি একটা বৈপরীত্বের কথা উল্লেখ করতে হয়। এবারে নির্বাচনে দলগুলি ২৬০০ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৫৫ জন মহিলাকে প্রার্থী করেছে। যা বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২৫৫ মহিলা প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। বিহারে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা মাত্র তিন (৩) বিহার বিধানসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১৫ শতাংশ।

বিহারে বিধানসভায় আসন সংখ্যা ২৪৩।

বিহার নির্বাচন ও অন্য রাজ্য

সায়ক ঘোষ চৌধুরী

দাদা, বিজেপি এই রকম বিহারের মতো ভোট চুরি করে গেলে কি করে আর ওদের ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে ?

এটা সত্যি যে বিজেপি ভোট চুরি করে। কিন্তু বিহারে মহাজোটের হারের কারণ 'ভোট চুরি' নয়। কারণটি এমন কিছু যেটা মহাজোট নেতৃত্ব জানেন। সমস্যাটা RJD-র ... কিন্তু সমাধানটি কংগ্রেসকে করতে হতো ।কংগ্রেস করতে পারে নি।

বিহারে যাদব জনসংখ্যা ১৫ শতাংশ মুসলিম ১৭শতাংশ... যদি এই সম্মিলিত ভোটও মহাজোট পেত , তাহলেও ৬৫টি আসন হয়ে যায়। মহাজোটের আসলে বিসমিল্লায় গলদ। 'যাদব ছাড়া কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে project করে না ' যেই মহাজোটের হাওয়া ওঠে, অন্য ছোট ছোট জাতের reverse consolidation হয়। 'ওহ, তাহলে যাদব - মুসলমানের সরকার হতে চলেছে ? বিরুদ্ধে NDA -কে ভোট দাও।'

এই সমস্যার দুটো সমাধান ছিল, (১) তেজস্বী যাদবের টানা ২ বছর ধরে অন্ধ্রপ্রদেশের SYR বা বিহারে প্রশান্ত কিশোরের মতো বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘোরা। সব জাতের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ঠিক যেটা তাঁর বাবা লালুপ্রসাদ করেছিলেন। (২) মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা না করে মুখ্যমন্ত্রী পদের ২-৩ টি option রাখা । কংগ্রেস এই কারণেই তেজস্বীকে 'মুখ্যমন্ত্রী' project করতে দেরি করছিলো। আর তেজস্বী প্রথমটা করেন নি। কংগ্রেস ভেবেছিলো, 'দলিত ভোট টেনে চিরাগ পাসোয়ান ফ্যাক্টরকে কাউন্টার দেবে' কিন্তু ,

(১) দলিত পার্টি ছাড়া দলিত consciousness তৈরি হয় না , কংগ্রেস BSP -র মতো 'দলিত পার্টি' নয় (২) দলিত টাকা যে দেবে তার দিকে ঢলে পড়ে ফলে রাহুল গান্ধীর 'দলিত strategy' কাজ করে নি। মহাজোটের 'যুব পলায়ন' narrative -কে নীতিশ কুমার counter দিয়েছেন 'মহিলাদের account -এ ১০,০০০ টাকা' দিয়ে। ফলে মহাজোটের তরফে কোনো ফ্যাক্টর কাজ করে নি। ঠিক হরিয়ানা নির্বাচনের মতো হয়েছে। ৩০শতাংশ জাঠকে টানতে গিয়ে বাকিরা আর ভোট দেয় নি।

হরিয়ানাতে হুডাকে যেমন ধরাও যায় না, আবার ছাড়াও যায় না , বিহারে মুসলিম-যাদব combination-এর এখন সেই অবস্থা। থাকলেও সমস্যা। না থাকলেও।

এর উপরে বোঝার উপরে শাঁকের আঁটির মতো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এসে বুঝিয়েছেন, 'যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী করবে তো মুসলমানের কি ?' বিহারে লালুপ্রসাদ বা উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিংহ যাদব যখন জনতা দলকে ভেঙে নিজেদের দল বানিয়েছিলেন, তখন সেটি সব পিছিয়ে পড়া লোকের পার্টি ছিল। লালু বা মুলায়ম 'যাদব নেতা' হিসাবে উঠে আসেন নি। 'পিছিয়ে পড়া মানুষের নেতা' হিসাবে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু যত সময় গেছে, ওঁরা নিজেদের পার্টিকে যাদব - মুসলিমের পার্টি বানিয়ে ফেলেছেন। আর সাফল্য তত অধরা হয়েছে। কখনো নীতীশকুমার, কখনো বিজেপি বাকি 'পিছড়ে'-দের টেনে নিয়েছে।

কংগ্রেসও চাইলে টানতে পারতো ২০০৪-২০১৪ এর মধ্যে। চেষ্টা যে রাহুল গান্ধী একদম করেন নি, সেটা নয়। ২০০৯- ২০১০ সালে বিহারে আর ২০০৯-২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস একা লড়েছিল। কিন্তু যথারীতি ground work না করে উপর থেকে লড়ার চেষ্টা করেছিল। আর দলের মধ্যে আঞ্চলিক দলের এজেন্ট পল্টু - মামারা সেই effort sabotage করে দিয়েছিলেন।

বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের অবস্থা বিহারের চেয়ে ভালো। অখিলেশ

শিক্ষিত মানুষ। ৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকার ফলে ওঁর across the castes একটা appeal রয়েছে। স্ত্রী ডিম্পল যাদব রাজপূত। ফলে উনি PDA বানিয়ে 'যাদব প্রভাব' কমানোর চেষ্টা করে চলেছেন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি - কংগ্রেস জোটটি সফল হয়েছিল কারণ, (১) মুসলিম ভোটে ভাগ হয় নি (২) রাহুল গান্ধী সংবিধান তুলে দলিত ভোট টেনে নিয়েছিলেন

কিন্তু উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের সমস্যা হলো, 'ওটি হিন্দুত্বের ধাত্রীভূমি'... 'হিন্দুত্ব ফ্যাক্টর' কাজ করে। যেটা বিহারে করে না। জাতপাতের ফ্যাক্টরই বিহারে প্রধান। অখিলেশের কংগ্রেসকে চাই। কারণ কংগ্রেস আলাদা লড়লে দলিত -মুসলিম ভোট কিছু কাটবেই। সেটাই কারণ। কিন্তু বিজেপি যে মনে করছে, 'বিহার জেতা মানেই উত্তরপ্রদেশ জেতা হয়ে গেলো', সেটা নয়।

'বিহারে বিজেপির জয়ে কি পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব পড়বে ?'

উঃ একটাই প্রভাব। সিপিএমের বিনাশে সীলমোহর পড়ে গেলো। নয়তো তৃণমূল কংগ্রেসকে বিজেপি কিছু করতে পারবে না। (১) মমতা ব্যানার্জী ব্রাহ্মণ। ফলে উচ্চবর্ণের ভোট বিজেপি যে পাবে বিহার - উত্তরপ্রদেশের মতো সেটা নয়। (২) মুসলিমরা বিহারের ফলাফল দেখে আবার মমতাকেই রেখে দিতে চাইবেন। ৮০শতাংশ মুসলিম যে আসনগুলোতে আছে, সেখানে কেবল কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হবে। (৩) মহিলা ভোট মমতার সঙ্গে। ওই নীতীশের মতোই। বিজেপির উচ্চবর্ণ নেতা এবং মহিলা ভোট দুটোরই অভাব। রাজবংশী, মাহাত , মতুয়া আর সিপিএমের নতুন প্রজন্মকে দিয়ে বাংলা জেতা সম্ভব নয়। উত্তর ভারতে কংগ্রেসের কি করণীয় ?

উঃ স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি করা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে। চানপাটিয়া কেন্দ্রে অভিষেক রঞ্জন জিতেছে। লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। ভূমিহার নেতা। কংগ্রেসকে আলাদা করে মুসলিম - দলিত নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন চাই সম্ভাব্য নেতাদের identify করা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কাজ দেখে।

'যুব কংগ্রেস কি এই কাজে ভূমিকা নিতে পারে ?'

উঃ দিল্লী থেকে পাঠানো পর্যবেক্ষককে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে হবে। কৃষ্ণা আল্লাভারুর বানানো যুব কংগ্রেস কোনো কাজের নয়। কংগ্রেসে দুটো মডেল ভালো কাজ করছে, (১) কর্ণাটক মডেল (২) রাজস্থান মডেল 'তেলেঙ্গানা মডেল'-টাকে আমি বাইরেই রাখছি। ঐটা 'রেড্ডি নির্ভর মডেল' !

কর্ণাটকে কংগ্রেসের একটি rainbow combination আছে। মুসলিম, দলিত, ভোক্কালিগা, লিঙ্গায়েত। আর মাথার উপরে OBC কুরুবা সিদ্ধারামাইয়া। যাঁর নিজের সম্প্রদায় খুব একটা dominant নয়। নিজেদের মধ্যে না লড়লে বিজেপির কাছে এই combination -এর কোনো সমাধান নেই।

আর 'রাজস্থান মডেল' নতুন করে উঠে আসছে। যেটা সচিন পাইলটের নেতৃত্বে বৈচিত্র্য পাচ্ছে। সচিন নিজে গুজ্জার। কিন্তু ওঁর অনুগামী মীনা এবং দলিতদের মধ্যেও। জাঠ নেতা দোতাসরা। অশোক গেহলোত আনেন মালি / সাইনি / কুশওয়াহ ভোট। এই বৈচিত্র্য রাখতে পারলে বিজেপি সবসময়ে চাপে থাকবে। ২০১৪, ২০১৯ লোকসভাতে যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন অনেক নতুন মুখ উঠে আসছে।

'কংগ্রেস কি শুধুই জাতপাতের অঙ্ক খেলবে ? development নিয়ে কথা বলবে না ?'

উঃ জাতপাতের অঙ্কের হিসাব ঠিকঠাক না কষে উন্নয়নের কথা বলে গেলে প্রশান্ত কিশোরের মতো অবস্থা হবে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কি করবে ?

উঃ (১) কারুর সঙ্গে জোটে যাবে না। (২) ২০২৭ পুরসভা আর ২০২৮ পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু যায়।

দেশের খবর

গিলোটিনে কি এবার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ?

মনিরুল হক

অন্য কোনও ভাবে নয়, সম্ভবতঃ গিলোটিনেই মুন্ডচ্ছেদ করা হবে পরিসংখ্যানবিদ্যা চর্চার পৃথিবী বিখ্যাত সংস্থা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যবস্থার। ভারত সরকার প্রস্তুত। তবে বেঁকে বসেছেন স্বশাসিত সংস্থা আই এস আই-এর পড়ুয়ারা , শিক্ষককুল, প্রাক্তনীরা, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এবং অবশ্যই সংস্থাটির ১৩০০ সদস্যের বেশিরভাগই। হতবাক হয়ে পড়ছেন আই এস আই-কে সম্ভ্রমের চোখে দেখা অগনতি জনতা।

সেই একযুগ আগে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি অন্যান্য অপকর্মের সাথে নিষ্ঠাভাবে যে কাজটা করে যাচ্ছে তা হল সবরকমের স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীন কাজকর্মকে স্তব্ধ করে দিয়ে সংস্থাটিকে নিজেদের কতৃত্বাধীনে নিয়ে আসা। তবে অনেকেই ভেবেছিলেন, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে হাত দেওয়ার সাহস মোদিজী পাবেন না। কিন্তু নোংরা হাতের ছায়া এখানেও এসে পড়ল।

কেন্দ্রীয় সরকারের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসব করেছে একটি খসড়া বিল যা খুব দ্রুত আইনে পরিণত করা হবে। বিলটির নাম, 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল- ২০২৫'। তাঁদের ভাষ্য মতে, প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্যই এই বিলটি উপস্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁদের হাতিয়ার হল ২০২০ সালে সরকারেরই হাতে গড়া আর এ মাশেলকর কমিটির সুপারিশ। কমিটি বলেছিল, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আই এস আই-কে আরও আধুনিক হতে হবে।। সরকারের বক্তব্য, বিলটি আইনে পরিণত হলে সংস্থাটির আইনগত মর্যাদাও আরও বৃদ্বি পাবে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা আরও মজবুত হবে। এছাড়া আর্থিকভাবে আরও হৃষ্টপুষ্ট হবে আই এস আই।

গত শতাব্দীর তরুন বিজ্ঞানী, কলকাতা ও বিলেতে পড়াশুনো করা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে এবং কলেজ ও বাইরে তাঁর বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৯৩১ সালে গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। ১৯৩২ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী সংস্থাটি নিবন্ধিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল -

১) পরিসংখ্যানবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২) তাত্বিক পরিসংখ্যানের উন্নয়ন ঘটানো।

৩) বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে পরিসংখ্যানবিদ্যা প্রয়োগ করে ফল লাভ করা। প্রতিষ্ঠানটির পাঠ্য তথা গবেষণার বিষয় ছিল ব্যাপক। পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় যথা গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য বিজ্ঞান, গাণিতিক অর্থনীতির চর্চাও চালু ছিল। বর্তমানে তো তাত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞান অন্যতম প্রধান চর্চিত বিষয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকেই ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। সেই কারণে আমেরিকাতে পরিসংখ্যানবিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়ে আই এস আই-কেই মডেল ধরা হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজ পর্যন্ত আই এস আই স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর নেহরু নেতৃত্বাধীন সরকার আই এস আই-এর মতো সংস্থার গুরুত্ব সম্যক ভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁরা এই সংস্থার কাজে সর্বদা সহায়তা করে গেছেন কিন্তু কখনও অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন নি। ১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে প্রতিষ্ঠানটিকে 'Institute of National Importance' এর মর্যদা দান করেছে। সোসাইটি হিসাবে সংস্থার অস্তিত্বও এই আইনে স্বীকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আর্থিক সাহায্য এবং পরামর্শ দেয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিলেন উদার।

সোসাইটির সদস্যরা দু'বছর অন্তর সাধারণ সভা থেকে একটি কার্যকরী কাউন্সিল নির্বাচিত করেন, আর নির্বাচিত করেন একজন সভাপতি। পূর্ববর্তী নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে একজন সভাপতি পদে দাঁড়িয়ে ছিলেন তবে পরাজিত হন। সংস্থার বিধিতে সভাপতি পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতির সম্মতিতেই নিয়োগ পান ডিরেক্টর। নিয়োগপ্রাপ্ত ডিরেক্টরই সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে খসড়া বিলে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে (১) ১৯৫৯ সালের আইন বাতিল হচ্ছে। (২) আই এস আই সোসাইটি বলে কিছু থাকছে না। থাকছে না কার্যকরী কাউন্সিল। সভাপতি পদও স্বাভাবিক ভাবে বিলুপ্ত হবে। (৩) সংস্থাটি পরিচালিত হবে রাষ্ট্রপতির অধীনে। তিনিই হবেন 'Visitor'. (৪) তৈরি হবে একটি 'Board of Governenceó. "þyîû Chairperson হবেন রাষ্ট্রপতি মনোনীত। কমিটি হবে ছোট এবং শক্তিশালী। কমিটির সদস্যরা হবেন বিভিন্ন মন্ত্রকের আমলা এবং কোনও কোনও সংস্থার প্রতিনিধি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'Visitor Board of Governance' এর নামে গোটা প্রতিষ্ঠানটাই চলে যাচ্ছে সরকারের কব্জায়। বস্তুতঙ্ম 'আধুনিকীকরণ, 'সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো' এসব হল ফালতু কথা। আসল কথা হল, 'চলো দখল করি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট'। প্রস্তুতি চলছে অনেকদিন ধরে। এই তো ক'দিন আগেই ওখানে পোস্টার পড়ল, Dogs and Muslims are not allowed'.

খসড়া বিল পেশ হওয়ায় আই এস আই-এর সঙ্গে যুক্ত সবাই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। গত ২০ নভেম্বর তারিখে সোসাইটি তার সদস্যদের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে। সেই সভা থেকে প্রস্তাবিত বিলের তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে। তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছেন —

১) বিল পাশ হলে প্রতিষ্ঠিনের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস হবে।

২) অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

৩) নিয়মমাফিক কোন নির্বাচন হবে না।

আই এস আই এর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী, শিক্ষক, সবাই খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁরা কলকাতাতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের সঙ্গে পার্থ মজুমদার, ভারত সরকারের ন্যাশনাল সায়েন্স চেয়ার ও ISI এর প্রাক্তন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন সরকার তাঁদের সঙ্গে সামান্যতম আলোচনা করার সৌজন্যও দেখায়নি। তাঁরা সরকারের পদক্ষেপকে 'Legislative Takeover' বলে নিন্দা করেছেন। ২৮ নভেম্বর তাঁরা বরাহনগরে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে মানব-বন্ধন কর্মসূচী পালন

করেছেন। তাঁরা ঘোষনা করেন সরকারের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ তাঁরা মেনে নেবেন না।

আমাদের নির্বাচিত সরকার মোটেই উদাসীন নয়। দেশের মানুষকে এই বিলের বিষয়ে তাঁদের মতামত জানানোর জন্য সময় দিয়েছিলেন। গত ২৪ নভেম্বর ছিল মতামত জানানোর শেষ তারিখ। হয়ত অনেকে মতামত জানাতে পারেন নি তাই দয়াপরবশ হয়ে এই দয়ালু সরকার মতামত সংগ্রহের সময় বা-ড়ি-য়ে দিয়েছেন ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এদিকে পার্লামেন্ট অধিবেশনের সময়সীমা কমছে আর কমছে। সেখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে আলোচনার জন্য। 'আই এস আই -২০২৫' বিল নিয়ে কি তেমন আলোচনার সুযোগ থাকবে, না কি টুক করে পাশ হয়ে যাবে বিলটি !

চারটি শ্রমকোড কেন বাতিল করতে হবে

কুশল দেবনাথ

বিজেপি-পরিচালিত এনডিএ সরকার ২৯টি শ্রম আইনকে চারটি লেবার কোডে পরিণত করে সংসদে পাশ করেছে। এই আইন কার্যকর করা যাচ্ছিল না, তার কারণ বিধি (rules) তৈরি হয়নি। বিধি তৈরি না হলে কোনো আইন লাগু করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের তিনটি রাজ্য বাদ দিয়ে সব রাজ্যই ইতিমধ্যে বিধি তৈরি করেছে। এ বছরের গোড়ায় কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর ঘোষণা করেছিল, পয়লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে সারা দেশে শ্রম কোড লাগু করা হবে। শেষ অবধি তা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সারা ভারতে যখন শ্রম কোড চালু হবে, তখন পশ্চিমবঙ্গেও কি আইন লাগু হবে? হ্যাঁ হবে, কারণ শ্রম যে হেতু যুগ্ম তালিকাভুক্ত, তাই কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফিকেশন জারি করতে পারে যে, যে রাজ্যগুলি বিধি তৈরি করেনি, সেগুলিতেও কেন্দ্রীয় বিধি লাগু হবে।

২০২০ সালে তিনটি কৃষি আইন ও চারটি শ্রম কোড লোক সভায় বিল আকারে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্বার কৃষক আন্দোলনের জেরে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। শ্রম কোডের বিরুদ্ধে গোটা দেশে বিভিন্ন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন যে প্রতিবাদ করেনি, এমনটা নয়। কিন্তু সেই প্রতিবাদের ধার অনেক কম ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার জন্যই আজ গোটা দেশে শ্রম কোড লাগু হতে চলেছে।

প্রশ্ন আসে, বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে যে শ্রম আইন এসেছিল, তার সাথে এই চারটি শ্রম কোডের পার্থক্যটা কী? এ যাবৎ কালে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রম আইন এসেছিল, তার প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই চারটি শ্রম কোড ভিন্ন ভিন্ন আইনকে একটা সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। তাই প্রতিটা আইনের যে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যগুলি ছিল, সেগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ১৯৭০ সালে যখন 'কন্ট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন ও অ্যাবোলিশন)' আইন আসে, তার উদ্দেশ্য ছিল ঠিকা শ্রমিকদের কাজের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা, ও ঠিকা প্রথার অবসান ঘটানো। যদিও ঐ আইনে ঠিকা শ্রম নির্মূল করা বা 'অ্যাবোলিশন'-এর কোনো কথা লেখা হয়নি, তবু এই উদ্দেশ্যে আইনটি তৈরি হয়েছিল। এ বারে 'অক্যুপেশনাল সেফটি, হেল্‌থ এবং ওয়ার্কিং কনডিশন' ২০২০ নামক শ্রম কোডটিতে ঠিকা শ্রমিকের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করা হোলো। ফলে ঠিকা শ্রমিকদের জন্য ১৯৭০ সালে প্রণীত মূল আইনটির তাৎপর্যই হারিয়ে গেল। আমরা দেখি, এই কোডের বিষয়টির 'উদ্দেশ্য' হিসেবে লেখা রয়েছে, পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের অবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঠিকা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল, যার জন্য আইনে ঠিকাদারদের লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, প্রধান নিয়োগকারীকে সময়মতো মজুরি মেটাতে, এবং অন্যান্য সুবিধা ঠিকা শ্রমিকদের দিতে বাধ্য করা হয়েছিল ; সে সব কিছুই আর নতুন আইনে নেই।

আমরা যদি চারটি শ্রম কোড খুঁটিয়ে পড়ি, তা হলে দেখব যে এই কোডগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণিকে টুকরো টুকরো মানুষে পরিবর্তিত করা। পুঁজিবাদের শুরুর পর্যায়ে শ্রমিক ছিল 'ক্লাস ইন ইটসেল্ফ'; 'শ্রমিক' একটি শ্রেণি-পরিচয়। কিন্তু ধারাবাহিক লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকরা 'ক্লাস ফর ইট সেল্ফ' (নিজেদের জন্য নির্মিত শ্রেণি, স্বরচিত পরিচয়) অবস্থানে পৌঁছয়। লেবার কোডে এমন অনেক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যেখানে শ্রমিকরা সেই 'শ্রেণি' সত্বা হারিয়ে ফেলবে, কেবল 'ব্যক্তি' সত্বায় পরিণত হবে। অর্থাৎ পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, শ্রম কোড এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বেশির ভাগ শ্রমিকই শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক- ১৯৭০ সালে কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন ও অ্যাবোলিশন) অ্যাক্টে ২০জন শ্রমিক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করলে আইনি অধিকার পেতো। শ্রম কোডে সংখ্যাটা ৫০ করে দেওয়া হয়েছে।ফলে একজন কন্ট্রাকটর ৪৯জন শ্রমিককে নিয়ে কাজ করলে

আইন তাকে ছুঁতেও পারবে না। আর বিভিন্ন কোম্পানিতে ঠিকা শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় এবং কাজ করে, সেই সংখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত হয় না। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নানান ধরনের ঠিকাদারকে নানা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজনই ঠিকাদার সব ধরনের কাজ করেন, এমন নয়। কাজ এমন টুকরো টুকরো করে দেওয়ার ফলে, একজন ঠিকাদার ৫০জনের বেশি ঠিকা শ্রমিককে নিয়োগ করবেন, সে সম্ভাবনা কতটুকু? সুতরাং নতুন লেবার কোডে বেশির ভাগ ঠিকা কর্মীকে শ্রম আইনের বাইরেও নিয়ে আসা হলো। ফলত কন্ট্রাকটর কিংবা মূল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ওপর যথেষ্ট আক্রমণের চেষ্টা করবে।

এই শ্রম কোডগুলিতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার, অর্থাৎ ধর্মঘট করার অধিকার সুকৌশলে কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের বিষয়টিও। কারখানায় স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হওয়ার যে অধিকার শ্রমিকের ছিল, তা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধু ঠিকা শ্রমিক নয়, অন্য একটা বিরাট অংশের শ্রমিককেও লেবার আইনের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই শ্রমকোডে 'ফ্যাক্টরি'-র সংজ্ঞাও পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এত দিন আইনি সংজ্ঞা ছিল, 'যে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ-সংযোগ থাকলে অন্তত ১০জন শ্রমিক কাজ করে, অথবা বিদ্যুৎহীন প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২০জন শ্রমিক কাজ করে, তা 'ফ্যাক্টরি' বা কারখানার মর্যাদা পাবে। এবং এই আইনের সুবিধা পাবে। কিন্তু শ্রম কোডে শ্রমিক সংখ্যা পূর্বের আইনের দ্বিগুণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-সংযোগ আছে, এমন প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২০জন শ্রমিক কাজ করলে তারা শ্রমিকের মর্যাদা পাবে। আর বিদ্যুৎহীন প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৪০জন শ্রমিক কাজ করতে হবে। যে হেতু ভারতে অধিকাংশ কারখানা খুব কম শ্রমিক নিয়ে কাজ করে, তাই আইনে পরিবর্তনের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের কোনো আইনি সুবিধা থাকবে না। তাদের শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে নিয়ে যাবে শ্রম কোড। এই কোড শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণির পরিবর্তে অগুনতি টুকরো টুকরো মানুষে পরিণত করবে। এ হল সংগ্রাম ও সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই কোড বাতিলের লড়াই ছাড়া, অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির কাছে।

যে চারটি শ্রমিক কোড আইনে রূপান্তরিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০' ; শিল্পে শ্রমিক নিযুক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মধ্যে বিবাদ সম্পর্কিত আইন। এ বিষয়ে তিনটি পূর্বতন আইন ছিল 'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, ১৯২৬', 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডার্স' অ্যাক্ট, ১৯৪৬', এবং 'দ্য ইন্ডায়স্ট্রিয়াল ডিসপিউটস, ১৯৪৭।' এই কোডে একটি শব্দ সংযোজিত হয়েছে, 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট।' এতে লেখা হয়েছে, একজন শ্রমিক তার মালিকের সাথে লিখিত চুক্তি করবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের পরে (সেটা কয়েক মাস বা কয়েক বছর হতে পারে) তাকে আবার চুক্তি করতে হবে। অর্থাৎ ধারাবাহিক ভাবে কাজের সুযোগকে খর্ব করা হল, চুক্তিভিত্তিক, স্বল্পমেয়াদী নিয়োগকে আইনত বৈধ করা হল।

নরেন্দ্র মোদি সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর মরসুমি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ঢোকায়, সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। ২০১৮ সালে বস্ত্রশিল্পের জন্য এর 'গেজেট নোটিফিকেশন' জারি হয়। লেবার কোডে শিল্পের সমস্ত বিভাগে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এটা করতে এই সরকার এতটাই বদ্ধপরিকর যে গ্র্যাচুয়িটি আইনেরও পরিবর্তন করেছে। ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টের চুক্তি করলে এক বছরে গ্র্যাচুইটি পাবেন শ্রমিক। সরকারি ভাবে গ্র্যাচুইটি পাবার নিয়ম হল, অন্তত পাঁচ বছর কাজ করলে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যায়। কিন্তু সময়সীমা কমিয়ে এক বছর করা হল। আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল গ্র্যাচুইটি আইনের সংশোধন করে পাঁচ বছরের জায়গায় এক বছর কাজ করলেই গ্র্যাচুইটি দেওয়া হোক। সরকার মানেনি। এখন শ্রম কোডে এই সুবিধা দেওয়া হল কেন? এটা শ্রমিককে প্রলোভিত করার জন্য, যাতে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'-এর নিয়মে শ্রমিক মালিকের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেগ্ধ কিন্তু স্বল্পমেয়াদী এই চুক্তি যদি মালিক পুনরায় নবীকরণ না করে, তা হলে তো গ্র্যাচুইটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব পাওনার শেষ হবে।

অর্থাৎ 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' চুক্তিতে একবার ঢুকলে স্থায়ী চাকরির সম্ভাবনা, শ্রমিকের বিভিন্ন অধিকার, সব বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি শ্রমিকের সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন করার বিষয়টি আর থাকবে না। ফিক্সড টার্মে যে শ্রমিক কাজ করছে তার মধ্যে অহোরহ এই ভয় থাকবে যে যদি সে মালিক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তা লিখিত চুক্তির বিরুদ্ধে হবেগ্ধসুপরিকল্পিত ভাবে ফিক্সড টার্ম ব্যাপারটা আনা হয়েছে যার ফলে স্থায়ী শ্রমিক থাকবে না, শ্রমিকের কোনো সুরক্ষা পাবে না, শ্রমিকরা ইউনিয়নভুক্ত হবে না বা সংগঠিত প্রতিবাদ করবে না। কারণ, ফিক্সড টার্ম চুক্তিতে যে শ্রমিক কাজ করছে তার মধ্যে অহরহ এই ভয় থাকবে যে যদি সে মালিক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যায়, তা হলে তা লিখিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করবে। সুপরিকল্পিত ভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে 'ফিক্সড টার্ম' চুক্তির ব্যাপারটা আনা হয়েছে যার ফলে স্থায়ী শ্রমিক থাকবে না, শ্রমিকের কোনো সুরক্ষা পাবে না, শ্রমিকরা ইউনিয়নভুক্ত হবে না বা সংগঠিত প্রতিবাদ করবে না। আর

এখানে সরকার বা লেবার দপ্তরের কোনো দায়ও থাকবে না। কারণ মালিকের সাথে লিখিত চুক্তি করেই ব্যক্তি শ্রমিক কাজ পেয়েছেন্ধ সরকার বা শ্রম দপ্তরের এখানে কিছু করার নেইন্ধ এমনকি শ্রমিক কোনো আইনি সুরক্ষাও পাবে না। কারণ আদালতে যুক্তি আসবে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ লিখিত চুক্তি করে স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের শর্তাবলী মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ সব দিক থেকেই 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' একটি আদ্যোপান্ত দানবীয় আইন।

একটা প্রশ্ন আসতে পারে; এ দেশে বিভিন্ন শিল্পে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকই বেশি। 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'-এর সঙ্গে তা হলে তফাতটা কী হল? মূলগত ভাবে তফাত না থাকলেও একটি তফাত আছেন্ধতা হল, চুক্তিভিত্তিক বা কনট্র্যাকচুয়াল শ্রমিকের ক্ষেত্রে সব সময় নিয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না, বা লিখিত চুক্তি করতে হয় না। কিন্তু 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে লিখিত চুক্তি থাকতে হবে। আরও বড় সমস্যা হল, শ্রম কোডে এটা অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে একে আইনত বৈধ করা হল। আরও যে সমস্যা পরবর্তী কালে আসবে তা হল, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা আদালতের যে একটা ভূমিকা থাকে, তা কার্যত নাকচ হয়ে যাবে।

এরপর এই কোডের আরও দুটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ; ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইন বিষয়ে।

ধর্মঘট বিষয়ে আগে বলা ছিল, এক দল শ্রমিকের কাজ বন্ধ করা বা সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে না চাওয়াকে 'স্ট্রাইক' বা ধর্মঘট বলা হবে। এ বার তার সঙ্গে আরও একটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছেন্ধ পঞ্চাশ ভাগের একজন বেশি শ্রমিক যদি ছুটি নেয়, তা হলে সেটাও ধর্মঘট হিসাবে গণ্য হবে। শ্রমিক কাজ করতে চায় না, বা কাজ বন্ধ করে তার অধিকার আদায়ের জন্য। কিন্তু ছুটি তো একটা অধিকারন্ধ৫০ ভাগের একজন বেশি শ্রমিক ছুটি নিলে সেটা কেন ধর্মঘট হিসাবে গণ্য হবে? এতে ছুটি বা জ্রত্রথডত্র-কে ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এটা একটা অধিকার জোর করে কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, আগে জনপরিষেবার কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে চাইলে নোটিস দিতে হত। বাকি শিল্প, যা 'পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস'-এর মধ্যে পড়ে না সেখানে ধর্মঘটের জন্য আগাম নোটিস দিতে হত না। শ্রম কোডের নিয়ম অনুসারে ধর্মঘট করার বিষয়টি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত হয়ে যাবে ; ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিস দিল, মালিক মানল না, সেটা শ্রম দপ্তরে দু'তরফের বিবাদ বা 'ডিসপ্যুট' হিসেবে গেল। তারপর শুরু হল আলোচনা। আলোচনা চলাকালীন কোনো পক্ষ এক তরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, বলছে কোড। অর্থাৎ কার্যত ধর্মঘটের বিষয়টা এক অন্তহীন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে গেল। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কোনো কারখানায় মালিক বা কর্তৃপক্ষ একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয়। অথবা, দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক মারা গেলে, বা গুরুতর আহত হলে শ্রমিকরা তক্ষুণি কাজ বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকদের এই সমবেত প্রত্যাঘাতে মালিকপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই পিছু হটেছে। এ যাবৎ এটা বে-আইনি কাজ হিসেবে গণ্য হত না। কিন্তু বর্তমানে কোনও পরিস্থিতিতেই তাৎক্ষণিক কাজ বন্ধ করা যাবে না। শ্রমিকদের নোটিস দিতে হবে, তারপর ধর্মঘট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। অর্থাৎ আইনের প্যাঁচে এই ধরনের সমস্ত লড়াই চলে যাবে বিশ বাঁও জলে। এই ভাবে ধর্মঘটের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে শ্রম কোডে।

নতুন শ্রমকোডে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। যে কোনো কারখানায় একের অধিক ইউনিয়ন থাকলে, কোনও শ্রমিক সংগঠনকে আইনত স্বীকৃত বা 'রেকগনাইজড' ইউনিয়ন হতে গেলে মোট শ্রমিকদের ৫১% বা তার বেশি নাম মাস্টার রোলে থাকতে হবে। যদি ৫০%-এর বেশি শ্রমিকের সমর্থন কোনো ইউনিয়ন না পায়, তা হলে আনুপাতিক হারে কাউন্সিল তৈরি করতে হবে। সেই কাউন্সিলই মালিকপক্ষের সঙ্গে দর কষাকষি করবে। আপাত ভাবে মনে হয় ৫১% বেশি শ্রমিকের নাম মাস্টার রোলে থাকলে ব্যাপারটা তো মন্দ নয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় ; ৫১% শ্রমিকের নাম মাস্টাররোলে রাখার বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়নি। ফলে ইউনিয়ন তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক দলের, বা কারাখানা মালিকের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। তাদের পছন্দের ইউনিয়নের শ্রমিকদের ৫১ শতাংশ বা তার বেশি সদস্যের নাম মাস্টাররোলে ওঠানোর চেষ্টা জারি থাকবে। আর ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা যাই হোক,খ. প্রধান এজেন্ট হিসেবে নির্বাচনের কোনো কথা এই আইনে নেই। স্বাভাবিক ভাবেই ইউনিয়নের উপর শাসকদলের বা মালিকের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি থাকবে।

এর আগে আমরা দেখেছি, 'ফ্যাক্টরি'-র সংজ্ঞা বদলে বহু কারখানা শ্রমিককে আইনের সুরক্ষার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার'; যার উল্লেখ 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০'-তে লেখা আছে। তিনশো বা তার বেশি শ্রমিক যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন সেখানে স্ট্যান্ডিং অর্ডার থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, স্ট্যান্ডিং অর্ডারের গুরুত্ব কোথায় ছিল? স্ট্যান্ডিং অর্ডারে কী থাকে? শ্রমিকদের বিভাগ নির্ণয় (ক্লাসিফিকেশন)

অর্থাৎ শ্রমিকটি স্থায়ী না ক্যাজুয়াল, নাকি বদলি শ্রমিক, ইত্যাদি। এ ছাড়া কাজের সময় থেকে শুরু করে শিফট কী ভাবে চলবে, টিফিনের সময়, বেতন কখন, কবে দেওয়া হবে, ছাঁটাইয়ের শর্ত, খারাপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা; অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কর ব্যাপারটি নীতিভুক্ত হয়। দু'ভাবে স্ট্যান্ডিং অর্ডার হয়। একটা থাকে মডেল স্ট্যান্ডিং অর্ডার, আরেকটা মালিক-শ্রমিক চুক্তি হয় লেবার দপ্তরের উপস্থিতিতে। এখন কিন্তু ৩০০-র চেয়ে কম শ্রমিক কাজ করলে সেখানে কোনো স্ট্যান্ডিং অর্ডার থাকবে না। অর্থাৎ ফ্যাক্টরি চলার অভ্যন্তরীণ রীতি তুলে দেওয়া হল।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, নতুন আইনে নানা সংজ্ঞা এবং বিধি বদল করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে আইনের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকদের মৌলিক আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছেধ্বকাড়া হয়েছে সংগঠন ও সংগ্রামের অধিকার।

অপর দিকে যে সব শ্রমিকেরা আজ শ্রম আইনের আওতায় নেই, সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের বিষয়ে চারটি শ্রম কোড কী অবস্থান নিয়েছে? বেশি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, কিছু উদাহরণই যথেষ্ট। লাখ লাখ গৃহপরিচারিকাদের সম্পর্কে কোডে কোনো কথা বলা নেই। আর আজকের শ্রম-বাজারে যে শ্রমিকদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়, সেই গিগ শ্রমিকদের ব্যাপারে লেখা আছে, 'workers means a person who performs work or participates in a work arrangement and earn from such activities outside of traditional employer-এর employee relationship.' মানে প্রথাগত মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের বাইরে থাকবে গিগ শ্রমিকরা। তাদের কোনো আইনি অধিকার থাকবে না। শুধু কিছু প্রকল্পের সুযোগ পাবে। এ সব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে চারটি শ্রম কোড সমস্ত ধরনের শ্রমিকের মৌলিক আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার একটি হাতিয়ার। এই চারটি শ্রম কোডকেই বাতিল করার দাবিতে সমস্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন হল, আজ ভারতে কেন এই শ্রম কোড আনা হল? বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা কি? এর পিছনের রাজনীতিটা আমরা বুঝব কী ভাবে? রাজনীতি বুঝতে না পারলে সঠিক প্রতিরোধও গড়া যাবে না।

কয়েকটা প্রশ্নে ভাগ করে এর উত্তর খুঁজব।

১) শ্রমকোড বা শ্রম আইন আনার প্রেক্ষিতটা কী?

বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আসার পর শ্রমিক শ্রেণি পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অধিকারের দাবিতে সংগঠিত হওয়া শুরু করে। 'মেশিন-ভাঙা' আন্দোলন থেকে বিভিন্ন বিভাগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, পরবর্তীতে বিভিন্ন কারখানায় কিংবা শিল্প-ভিত্তিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মে দিবসের লড়াই ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের শ্রেণিগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ। ইতিমধ্যে ১৮৭১ সালে প্যারি-কমিউন ঘটে। ১৯১৭ সালে শ্রমিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রাশিয়ার। রাশিয়ার বিপ্লব গোটা পৃথিবীতে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনে। ঐ সময় বিভিন্ন দেশে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনি অধিকার পাবার লড়াই জোরদার করে। অপর দিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়েও অংশগ্রহণ করে। অন্য দিকে বুর্জোয়ারাও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে শ্রমিকদের কিছু আইনি অধিকার দিতে বাধ্য হয়। এবং নানান ধরনের শ্রম আইন তৈরি হয় নানান দেশে। মানে রাষ্ট্র একটা নিয়ম প্রবর্তন করে যা শ্রমিক, মালিক, রাষ্ট্র সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এই সব আইনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি কিছু আইনি অধিকার পায়। শ্রমিক বিপ্লব যাতে না হয়, তার জন্য বুর্জোয়ারা এই অধিকার দিতে কিছুটা বাধ্যও হয়। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন না থাকলে শ্রমিকদের এই আইনি অধিকার অর্জন হতো না। শ্রমিকরা যা কিছু আদায় করেছে, সংগঠনের জোরে, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জোরেই করেছে।

আমাদের দেশের সংগঠিত শিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। এ দেশের শ্রমিকরা আন্দোলনের জোরে বেশ কিছু আইনী অধিকার অর্জন করেছে। ভারত রাষ্ট্রে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শাসন থাকা সত্ত্বেও অনেক লড়াই করে শ্রমিকরা এই অধিকার অর্জন করেছিল। শ্রমিক আন্দোলন যত দুর্বল হতে থাকে, পুঁজিপতি শ্রেণি ততই শ্রমিকের আইনি অধিকারকে খর্ব করতে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। ফলে বহু ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা তাদের ইচ্ছেমতো নিয়ম প্রবর্তন করতে শুরু করে। কাজের ঘন্টা বাড়ানো, স্থায়ী শ্রমিক প্রথা রদ, বেতন সংকোচন, চুক্তি শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যায় বৃদ্ধি, ইচ্ছেমতো ছাঁটাই, যখন-তখন কাজ বন্ধ করা, ইত্যাদি চলতে থাকে। এক কথায় শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে।

২) আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি?

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দু'টো বিষয় নিয়ে একটু কথা বলে নিতে হবে।

(ক) গত শতাব্দীর ন'য়ের দশক থেকে এই দেশে নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির আগমন ঘটে, কংগ্রেসের নরসীমা রাও ও মনমোহন সিংহের আমলে যার প্রবর্তন হয়। এটি গোটা দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিপুল বদল আনে।

(খ) এই পর্যায়েই এ দেশের ফ্যাসিস্ট দল বিজেপির বিপুল

শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী কালে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সবচেয়ে আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক, হিংস্র পুঁজিপতি গোষ্ঠী বিজেপি-কে নিঃশর্ত সমর্থন দেয়। ফ্যাসিবাদ সব সময় প্রধান প্রতিপক্ষ করে শ্রমিকশ্রেণিকে। শ্রমিক শ্রেণি যাতে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে সংঘবদ্ধ না হতে পারে, শ্রমিকদের শ্রেণিগত ঐক্য ভেঙে যাতে শ্রমিকরা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়, মতাদর্শের দিক দিয়েই ফ্যাসিস্টরা তা নিশ্চিত করতে চায়। ফ্যাসিবাদী শাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে তফাৎ হলো, ফ্যাসিবাদী শাসনে স্বৈরাচার থাকবে, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনে ফ্যাসিবাদ থাকবেই; এমনটা নয়। একটু আলোচনা করা যাক। ১৯৭০-১৯৭৬ যখন ইন্দিরা গান্ধীর চরম স্বৈরাচারী শাসন চলছে, সেই সময়েই তিনটি শ্রম আইন তৈরি হয় ঃ১৯৭০ সালে কন্ট্রাক্ট প্রথা (রেগুলেশন ও এ্যবুলেশন) আইন, ১৯৭২ সালে গ্র্যাচুইটি আইন, ১৯৭৬ সালে সমকাজে সমবেতনের আইন। দেশে স্বৈরশাসন চলাকালীনই এই আইনগুলি পাশ হয়েছিলো, যেগুলি শ্রমিক-স্বার্থ কিছুটা হলেও রক্ষা করেছিলো। কিন্তু ২০১৪-২০২৫, এই এগারো বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকার শ্রমিক স্বার্থে একটাও আইন তৈরি করেনি। উপরন্তু ২৯টি শ্রম আইনকে চারটে শ্রম কোডে পরিবর্তিত করে শ্রমিকদের আইনি অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যে চারটি শ্রম কোডের মাধ্যমে কার্যত এই সরকার বেশির ভাগ শ্রমিককে শ্রম-আইনের বাইরে নিয়ে এসে গেছে। অপর দিকে যেটুকু আইন থাকবে, সেটা প্রত্যক্ষ ভাবে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করবে। যেমন ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন করা, মজুরির প্রশ্ন, গিগ-প্ল্যাটফর্ম শ্রমিক-সহ অজস্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আইনকে দাঁড় করানো, ইত্যাদি। এক কথায় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ফ্যাসিস্ট শক্তি তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে দাঁড়াবে। কোনো মতেই যেন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে না পারে। এটা আরো ভালো ভাবে লক্ষ করা যাবে গুজরাটে। এই পর্যায়ে দুটি রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তুলনামূলক ভাবে সক্রিয়, গুজরাট ও তামিলনাড়ু। এ দেশে চারটি শ্রম কোড আইনে রূপ পাওয়ার পরও দেশব্যাপী শ্রমিকদের নানান প্রতিবাদের জন্য আজো শ্রমবিধি তৈরি হয়নি। ফলে চারটি শ্রম কোডকে প্রায়োগিক স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই অন্তত একটি ক্ষেত্রে আট ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা কাজের জন্য অর্ডিন্যান্স গুজরাট সরকার লাগু করেছে। অথচ সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টায় কাজের কথাও লেখা আছে। তার মানে এক দিকে দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজকে আইনত বৈধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, অপর দিকে সপ্তাহে চার দিন কাজ করতে হবে। এখন, একটা শিল্প তো তিন দিন বন্ধ রাখা যাবে না! ফলে এই অর্ডিন্যান্সের ফলে বাকি দু'দিন বেআইনি প্রক্রিয়াকে আইনি প্রক্রিয়া করে দেওয়া হলো। ফ্যাসিস্ট শক্তির আঁতুড়ঘর গুজরাট। তাই গুজরাটে অর্ডিন্যান্স করে তারা দেখে নিতে চায় ১২ ঘন্টার কাজকে আইনত বৈধ করলে সমাজ জুড়ে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়। আর সেই জন্যই এই অর্ডিন্যান্স। এক কথায়, শ্রম কোড আনার পিছনে এটাই বিজেপি-র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এক দিকে যেমন বেশির ভাগ শ্রমিককে আইনের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া, অপর দিকে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়ে আরো জোরের সাথে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করা।

এখন প্রশ্ন হলো, এর বিরুদ্ধে লড়াইটা কিভাবে গড়ে উঠবে? প্রতিরোধ কিভাবে করবে শ্রমিক শ্রেণি? এই আলোচনায় যাবার আগে আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে একটু কথা বলে নিতে হবে।

দীর্ঘ দিন ধরে শ্রমিক আন্দোলন একটা ভাটার পর্বের মধ্য দিয়ে চলছে। এক দিকে পুঁজিপতি শ্রেণির নিত্যনতুন, একচেটিয়া হামলা চলছে, সেই সঙ্গে উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে, অপর দিকে দীর্ঘ লড়াই করে শ্রমিকশ্রেণি যে অধিকার অর্জন করেছিল সেগুলি আস্তে আস্তে হাতছাড়া হচ্ছে। আজকের শ্রম কোডে যে সব অধিকার ধরে রাখার জন্য লড়াই করা হচ্ছে, বাস্তবে সেগুলো হারানোর প্রক্রিয়া অনেক দিন ধরেই সমাজ জুড়ে চলছে। যেমন স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ প্রথা রদ, চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ ও ঠিকা শ্রমিক বৃদ্ধি, কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি, কাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অবাধ ছাঁটাই-সাসপেন্ড, মজুরি কমানো, ধর্মঘট-সহ যে কোনও শ্রমিকদের লড়াইয়ের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শুরু করে যে কোন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, পরিষেবা শিল্প সর্বত্র অস্থায়ী শ্রমিক ও কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন ধরনের শ্রমিক, যেমন গিগ শ্রমিক, প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের আইনি অধিকার দেওয়া হয়নি। গৃহশ্রমিক থেকে মিড ডে মিল কর্মচারী, এদের জন্য কোনো আইন নেই। এক কথায়, কোটি কোটি মানুষ শ্রম দিচ্ছেন, সম্পদ তৈরি করছেন অথচ তাঁদের সুরক্ষার জন্য কোনো আইন নেই। শ্রমিক আন্দোলনের এই ভাঁটার সময়ে এক দিকে দীর্ঘ দিন আগে অর্জিত অধিকারগুলি হারাচ্ছেন, অপর দিকে অজস্র যে নতুন 'শ্রমিক' যোগ দিচ্ছেন নানা ধরনের কর্মক্ষেত্রে, নানা ধরনের শর্তে, তাঁদের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এই হচ্ছে আজকের শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা। কোথাও যে লড়াই বা প্রতিরোধ হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই হচ্ছে আজকের শ্রমিক আন্দোলনের পরিস্থিতি। একটা প্রশ্ন আসবেই; এই তো কিছু দিন আগে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল। সেখানেও তো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কিছু ছবি পাওয়া গেছে। তা হলে? হ্যাঁ, এটা সত্য যে বিজেপি বাদে প্রায় সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দল ও তাদের

পরিচালিত ইউনিয়ন, অজস্র ছোট ছোট ট্রেড ইউনিয়ন, নকশালপন্থীদের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, নানা ধরনের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাতে একটা রাজনৈতিক ছবি আমরা পেয়েছি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে একেবারে নীচুস্তরে বা তলার শ্রমিকদের মধ্যে নাড়াচাড়া ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। গুড়গাঁও থেকে অটোমোবাইল শিল্পের যে ছবি আমরা পেয়েছি, তাতে দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ শ্রমিক অটোমোবাইল শিল্পে কাজে যোগ দিয়েছে। এ রাজ্যেও বিভিন্ন চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পতে মিশ্র ছবি আমরা দেখেছি। যার মানে দাঁড়ায়, রাজনৈতিক স্তরে কিছু উদ্যোগ সৃষ্টি হলেও, শ্রমিক আন্দোলনকে জীবন্ত করতে এই ধর্মঘট প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা ; এক দিনের ধর্মঘট তো হল, এর পর কি? সেই ধরনের কর্মসূচীও শ্রমিক আন্দোলনের সামনে আনা যায়নি। ফলে কার্যত ধর্মঘট একটি ইভেন্টে পরিনত হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘকালীন ভাঁটার কারণ খুঁজলে আমরা দেখতে পাবো, এক দিকে 'মনোপলি ক্যাপিটাল'-এর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, যাকে রাষ্ট্র পুরোপুরি মদত দিয়ে যাচ্ছে, অপর দিকে বিভিন্ন সংসদীয় দলের নেতৃত্বের আপসকামিতা, যা কার্যত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের রাশকে টেনে ধরেছে।

এ দেশে, এ রাজ্যে, শ্রমিক আন্দোলনের এক দীর্ঘকালীন আপসহীন লড়াইয়ের ঐতিহ্য আছে। শ্রমিকরা এগোতে চেয়েছে, কিন্তু আপসকামী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই লড়াইয়ের প্রতি বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দু-দুবার রেলশ্রমিকরা গোপন ব্যালটে লাগাতার ধর্মঘটের কথা বলেছে, কিন্তু নেতৃত্ব সেই পথে পা বাড়ায়নি। শুধু রেলের ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সব শিল্পেই নেতৃত্ব এ ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আমার জানি, কারখানা বা শিল্পে শ্রমিক-মালিক দু'টো পক্ষ থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু আজ শ্রমিক আন্দোলনে মালিক-ট্রেড ইউনিয়ন-শ্রমিক, এই তিনটি পক্ষ হয়ে গেছে। ফলে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন নীচুস্তর থেকে গড়ে উঠেছে না। ফলে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক কম। এর পাশাপাশি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের পদ্ধতি ও ধরনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে না।

এই অবস্থায় আজকের শ্রম কোড বাতিলের লড়াই চালাতে গেলে আঁকাবাঁকা পথ এড়িয়ে, দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের পথে হাঁটতে হবে। শ্রম কোড শ্রমিকদের জন্য যে পরিবর্তনগুলি নিয়ে আসছে, তাকে ধৈর্য ধরে সমস্ত ধরনের শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এমনিতে শ্রম আইনের বিষয়ে শ্রমিকরা মাথা ঘামায় কম। কিন্তু শ্রম কোডের সাথে শ্রমিকদের জীবন জড়িয়ে আছে, সে কথাটা শ্রমিক আন্দোলনে গভীর ভাবে প্রোথিত করতে হবে। উপরের দিক থেকে শ্রম কোডের রাজনৈতিক বিরোধিতা ও স্বরূপ উন্মোচন চলুক, পাশাপাশি নীচুস্তরেও শ্রমকোডের বিভিন্ন অংশ নিয়ে লড়াই সংগঠিত হোক। সেটা নানা ভাবে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। এ ব্যাপারে রেডিমেড কোনো পদ্ধতি নেই। এই ভাবে উপর ও নীচের আন্দোলনের মিশ্রণে শ্রম কোড বিরোধী প্রকৃত লড়াই উঠতে পারে। বিশেষ করে একটা কথা বলা প্রয়োজন; যে হেতু ২৯টি আইনকে চারটি শ্রম কোডে পরিবর্তিত করা ফ্যাসিবাদের একটি অ্যাজেন্ডা, তাই এই শ্রম কোড-বিরোধী লড়াইকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের একটা অংশ হিসাবে আমাদের দেখতে হবে। (লেখক বিশিষ্ট সমাজকর্মী)

'Doctor Dialogue-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত'

কেন্দ্রের ৮.২ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির দাবি, বাস্তবের প্রতিফলন নেই — আই.এম.এফ

অমিতাভ সিনহা

কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত অসত্য প্রচার শুরু করেছে। সরকার বলছে এবছর জুলাই - সেপ্টেম্বর এর আর্থিক বৃদ্ধির হার নাকি ৮.২ শতাংশ যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা দেশ বিদেশের বিভিন্ন নামী মূল্যায়ন সংস্থার হিসাব ও পূর্বাভাসকে ছাপিয়ে গিয়েছে। যদিও এই পরিসংখ্যান প্রকাশের ঠিক আগে আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার বা আইএমএফ ভারতের অর্থনীতি নিয়ে তাদের বার্ষিক পর্যালোচনা রিপোর্ট সামনে এনেছে। এই রিপোর্ট আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য। ফলে সরকারের জারিজুরি প্রকাশ্যে চলে এল। এই রিপোর্টে ভারতের অর্থনীতিকে চারটি ক্যাটাগরির তিন নম্বর বা Grade"C" হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষের ধাপের ঠিক আগের ধাপ। তাদের বক্তব্য ভারত সরকারের হিসাব তৈরী করার জন্য নেওয়া তথ্যে গরমিল আছে। এর মধ্যেই পড়ে জিডিপি , বাজারে উৎপাদিত পণ্য পরিষেবার মোট মূল্য ইত্যাদি। আবার মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যেও বেশ ঘাটতি রয়েছে ও পুরানো বা সেকেলে পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা। তাই এই মূল্যায়ন হয়েছে Grade- 'B'। আইএমএফ ভারতে জাতীয় পরিসংখ্যানের মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং তাদের রিপোর্ট পাঁচটি দিক নির্ণয় করে ।

১) দেশের মোট উৎপাদন তথা জিডিপি ও উপভোক্তা মূল্যসূচক বা CPI (consumer price index) হিসাব করার জন্য এখনও

২০১১-১২ সালকে বেস ইয়ার বা ভিত্তি বছর বলে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইএমএফ এর মতে বর্তমান খরচের ধারা, মানুষের ব্যয়ের অভ্যাস, উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন এই ভিত্তি বছরে মোটেও ধরা পড়ে না। জিডিপি মাপার ক্ষেত্রে উৎপাদন ও খরচের হিসাব সামঞ্জস্যহীন।

২) প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্সের অভাব। জিডিপি গণনায় ডিফ্লেটর হিসাবে পাইকারি মূল্য সূচক বা WPI(wholesale price index) ব্যাবহার করতে হচ্ছে। প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্সের অভাবে বাস্তব উৎপাদন খরচ সঠিকভাবে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

৩) উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতির মধ্যে বড় ফারাক। যেভাবে হিসাব করা হচ্ছে তাতে উল্লেখযোগ্য গরমিল আছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে জল মেশানো।

৪) সমন্বয়ে অভাব। ভারতে ত্রৈমাসিক জিডিপি তথ্য এখনও ঋতু অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ (seasonally adjusted) নয়। এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক। পরিসংখ্যানগত আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত বলে আইএমএফ মনে করে।

৫) সংগৃহীত তথ্যে খামতি থাকছে।হিসাবের পদ্ধতি দূর্বল। অর্থনীতিতে নজরদারির খামতির ফলে বহু ক্ষেত্র এগোতে পারে না। ফলে তার আসল ছবি,অসংগঠিত ক্ষেত্র ও ক্রেতার খরচের অভ্যাস তথ্য পরিসংখ্যানে ফুটে উঠছে না।

সামগ্রিক ডেটা মানে ভারতকে গ্রেড- বি দিয়েছে আইএমএফ। ন্যাশানাল অ্যাকাউন্টস ছাড়া বাকি ক্ষেত্রগুলি যেমন সরকারি অর্থ পরিসংখ্যান, বৈদেশিক ক্ষেত্র, মানিটরি ও ফাইনান্সিয়ল ডেটা ইত্যাদিতে গ্রেড- বি পেয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে দেওয়া ডেটার গ্রহণযোগ্যতা নেই,অনেক খামতি বা ত্রুটি রয়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি তথ্যে গ্রেড- বি দিয়েছে আইএমএফ। ভারতের উপভোক্তা মূল্যসূচক তথা সিপিআই কেও গ্রেড-বি দেওয়া হয়েছে যার কারণ সিপিআই এর ভিত্তি বছর ২০১১-১২ ধরা হয়েছে। সেসময় ওজন পদ্ধতি,ব্যয় অভ্যাস ইত্যাদি বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তারা আরো বলেছে যে টাকার বিনিময়ের হার ব্যবস্থার নতুন শ্রেণীবিন্যাস হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। কারণ হিসাবে দায়ী করেছে মার্কিন বাণিজ্য শুল্কবৃদ্ধিতে ভারতের রপ্তানি ও পোর্টফোলিওর গতি হারানো। তাদের পূর্বাভাষ অনুযায়ী চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার হবে মোটামুটি ৬.৬ শতাংশ। বর্তমানে নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতিকে রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার আরও কমানোর অবস্থায় চলে আসবে বলে আইএমএফ মনে করে।

মোটের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রটি মোটেও উজ্জ্বল নয়। মোদী সরকার তাই তথ্যের হেরফের ঘটিয়ে এইসব চাপা দিতে চাইছে।

কারখানা বরাতের বিনিময়ে বিজেপিকে টাটা গোষ্ঠীর দান

শুভ মিত্র

বিজেপিকে টাটা গোষ্ঠীর দেওয়া বিশাল অংকের অনুদান দেওয়ার সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে তিনটি সেমি কন্ডাক্টর কারখানা তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। মোদী শাহের নিজের রাজ্য গুজরাটে দুটো ও অসমে একটা।এই কারখানা তৈরীর অর্ধেক খরচ সরকার উৎসাহ ভাতা হিসাবে দেবে বলে স্থির করে। তিনটির মধ্যে দুইটি কারখানার বরাত পায় টাটা গোষ্ঠী ।এর জন্য মোট ১.১৮ লক্ষ কোটি টাকা টাটা গোষ্ঠীর বিনিয়োগ করার কথা। যার মধ্যে ৪৪২০৩ কোটি টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই টাটা গোষ্ঠী কাটমানি বা তোলা হিসাবে ৭৫৮ কোটি টাকা দিয়েছে বিজেপির তহবিলে গুজরাট ও অসমে একটা করে কারখানার বরাত পাওয়ার বিনিময়ে। দেশের ইতিহাসে কোন একটা রাজনৈতিক দলকে কোন কর্পোরেটের এত বড় অঙ্কের দান একটা বিরল ঘটনা বলে জানা গেছে।

ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল শিল্পে সেমিকন্ডাক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। এটি আমদানি করতে হয় চিন ও তাইওয়ান থেকে। দেশে এই শিল্প গড়ে উঠলে এই দুটি দেশের ওপর নির্ভরতা কমে। তাই এই কারখানা স্থাপন একটা অতীব লাভজনক প্রকল্প। তাই এই কারখানাগুলিতে সরকার যদি শেয়ার হিসাবে বিনিয়োগ করত তাহলে সরকারের ঘরে লভ্যাংশ আসত। সরকার কেন সেটা না করে উৎসাহ হিসাবে এই বিরাট অঙ্কের অর্থ টাটাদের ও আরো একটি সংস্থা তামিলনারুর মুরুগাপ্পা গ্রুপকে পাইয়ে দিল তা সহজেই অনুমেয়। অনুমান টাটাদের মত মুরুগাপ্পা গ্রুপও যথারীতি বিজেপিকে তোলা হিসাবে কয়েকশ কোটি টাকা দিয়েছে। টাটা গ্রুপের প্রগ্রেসিভ ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট এর মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থা ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কাউকে কোন অনুদান দেয় নি।কিন্তু এই দুটি কারখানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদন পাওয়ার একমাসের মধ্যে উপরিউক্ত অর্থ বিজেপির তহবিলে দেয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে টাটাদের উক্ত ট্রাষ্ট বিজেপিকে মোট অনুদান দেওয়ার পরিমান ৯১৫ কোটি টাকা। লোভনীয় বরাত ও উৎসাহ ভাতা পেতে বহু কর্পোরেট সংস্থা বিজেপির তহবিল যে ভরিয়েছে তার প্রমাণ ইলেকট্রনিক বন্ড

কেলেঙ্কারির মাধ্যমে জানা গিয়েছিল।সুপ্রীম কোর্ট যাকে বলেছিল বেআইনী। এরপর এই বন্ড বিক্রি তুলে দেওয়া হয়। তখন এও দেখা গিয়েছিল নিম্নমানের ও মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ওষুধ যেসব কোম্পানি বাজারে বিক্রি করছে তারা কোটি কোটি টাকা বিজেপির তহবিলে দিয়ে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে এই তোলা দেওয়ার পর বহু কোম্পানির ওষুধের দাম লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে যায়।

মসজিদ, ভোট ও শিক্ষার তর্ক : মুর্শিদাবাদের প্রেক্ষাপট

জজবুল সেখ

বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ করার আহ্বান নিয়ে মুর্শিদাবাদের জনমানসে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মসজিদের অতিরিক্ত নির্মাণের পক্ষে কেউ নেই, কারণ বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট মসজিদ ও মক্তব রয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মীয় রাজনীতির চাপ যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও উন্নয়নের প্রতি উদাসীন। ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় আবেগকে ব্রত করে নেতামন্ডলী তাদের রাজনৈতিক জীবন চালাচ্ছেন। হুমায়ুন কবীর নিজেও প্রকাশ্যে বলেছেন, মসজিদ নির্মাণে বাধাদান করলে তিনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সুযোগের অভাব প্রকট। মসজিদ নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার পরিবর্তে স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হওয়া উচিত। অন্ধকার ও অপর্যাপ্ত সড়ক, স্কুলে শিক্ষকের অভাব, শিশুদের মৌলিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে গ্রামের জনমানুষ অবস্থান করছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র চাকরী নয় বরং একটি সুস্থ ও সভ্য সমাজ গঠন।

ভোট রাজনীতির অন্ধকারে ধর্মের নামে হানাহানি ও সহিংসতার উদ্বেগও প্রকাশ পেয়েছে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া না হলে তাদের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন থাকবে। শ্রেণী-বিভাজনের মধ্য দিয়ে বহু যুবকদের পড়াশোনা থেকে সরে দাঁড়ানো এবং কর্মসংস্থানের খোঁজে গিয়ে সঠিক ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তার অভাব উদ্বেগজনক। মসজিদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে তা কাজে লাগছে না। আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার যা পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রয়োগ করে দেখিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, মুর্শিদাবাদ সহ বাংলার গ্রামীণ মানুষের চাহিদা ও স্বপ্ন পূরণে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক উন্নয়ন চাই, যেখানে ধর্মীয় আবেগের পরিবর্তে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য সেবা ও জীবনমানের উন্নতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শুধুমাত্র মসজিদ স্থাপন নয়, বরং সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানসম্মত জীবন এবং নিরাপত্তা আধুনিকতার সেতুবন্ধন হওয়া আবশ্যক। লেখাপড়া ছেড়ে মহারাষ্ট্রে বা অন্যত্র মাত্র সাত আট হাজার টাকার হোটেল কর্মচারী/অন্য কাজ নিয়ে চলে যেতে হয় না গ্রামীণ যুব সমাজকে। আমিও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর গ্রামের মানুষের পরামর্শে ওই হোটেলে কর্মচারীর কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম এটা জীবনে বেঁচে থাকার সহজ বিকল্প হলেও সমাজে শিক্ষা প্রসারে নিজের শিক্ষিত হওয়া বিশেষ জরুরি। তাই ফিরে এসে ফের পড়াশোনা শুরু করি। জীবন সংগ্রাম করেই যেমন পেটের টানে কিছু একটা জুটিয়ে কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হয় আমাদের যৌবন। সমাজ থেকে একটু সহায়তা পেলে গ্রামীণ মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নেতারা, আইন প্রণেতারা সেই পথে হাটেন না। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর বাংলার মুসলিম সমাজের হাল জানতে সাচার কমিশনের বা রঙ্গনাথ কমিটির রিপোর্টের প্রয়োজন হয় না। চোখ কান খোলা রেখে গ্রামের পথে হাঁটলে সেই হালটা যেকোনো সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়বে। জনপ্রতিনিধিদের নজরে কি সেই চেহারা পড়ে না? অবশ্যই পড়ে। তারা তাদের কায়েমী স্বার্থে এই অবস্থাটা বজায় রাখতে চান।

মসজিদ-মন্দিরের এই রাজনীতির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় মুর্শিদাবাদসহ বাঙলার গ্রামীণ মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং মৌলিক পরিষেবার অভাবই তাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। রাজনীতিবিদরা যখন ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ব্যস্ত, তখন গ্রামের যুবকদের জীবিকার সন্ধানে পুনে বা অন্য রাজ্যে ছুটতে হয় হোটেলের কর্মচারীর মতো স্বল্পবেতনের কাজ নিতে ।

মসজিদ নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার পরিবর্তে সেই অর্থ স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা উন্নয়নে বিনিয়োগ করলে গ্রামীণ সমাজের অনেক বড় উপকার হতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র চাকরি পাওয়া নয়, বরং একটি সুস্থ ও সভ্য সমাজ গঠন। আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। নতুন করে বাবরি মসজিদ তৈরি করলে সেই ইতিহাসকে কি মুছে

ফেলা যায়? ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ওই দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন। আবার নতুন করে এবার ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট ও ক্ষমতার রাজনীতির কাছে ধর্মের টোপ ও সহিংসতা যেন প্রাধান্য না পায়, তা চাই মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গের যেকোন প্রান্তে এ সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ুক আমরা চাই না।

এতে কারো লাভ হলে হতে পারে আপামর গ্রামীণ গরিব হিন্দু বা মুসলিম কারো কোনও উপকারে আসবে না। তাই বলবো, বিধায়ক হুমায়ুন কবির সাহেব আপনি আপনার আসন্ন এই কর্মসূচি থেকে বিরত থাকুন। মুর্শিদাবাদের মানুষ চায় শিক্ষা, চায় স্বাস্থ্য, চায় কর্মসংস্থান- আরও একটি মসজিদ নয়। মানুষের প্রকৃত চাহিদাগুলোকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় রাজনীতির পথে হাঁটলে তা শুধু অশান্তিই ডেকে আনবে, কোনও স্থায়ী উন্নয়ন হবে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে :
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(৩)

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার থেকে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। ২০৩ মিনিট ধরে এতাবত কালের দীর্ঘতম ভাষণে তাঁর প্রিয় বিষয় অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যার চরিত্র পরিবর্তন নিয়ে বলেছেন , বলেছেন নতুন হারে জিএসটি প্রবর্তনের কথা ইত্যাদি । কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনি খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন, এই বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের জন্ম শতবর্ষ । তিনি বলেছেন এই আরএসএস পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও এবং এই সংগঠন সেবা ও ত্যাগের দ্বারা জাতির সেবা করে এসেছে । তিনি অবশ্য দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এই সংগঠনের কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি । আমরা জন্মের পর থেকে আরএসএস এর ভূমিকা কি ছিল সেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পারি । তাই এই নিবন্ধের অবতারণা।

এটি লেখাটির তৃতীয় তথা অন্তিম কিস্তি)

মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাড়ে পাঁচ মাস পর স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি অহিংসা ও সম্প্রীতির পূজারী মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করে। এই অশুভ শক্তির লক্ষ ছিল সদ্য স্বাধীন এই জাতি রাষ্ট্রকে বিপথগামী করা , দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন বিস্তার করা ।

মহাত্মাজির হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলানা আজাদ লিখেছিলেন- 'হিন্দু মহাসভা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের নেতৃত্বে কিছু হিন্দু প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে গান্ধিজি মুসলমানদের সাহায্য করছেন। গান্ধিজির প্রার্থনা সভায় তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হিন্দু শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে বাইবেল আর কোরান থেকেও রচনাংশ পড়া হত, এমনকী সেই প্রার্থনাসভাগুলো ভাঙার জন্যেও তারা এবার গোলমাল পাকাতে আরম্ভ করল। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে তিনি দিল্লি এলে তাদের একদল লোক তাঁর প্রার্থনা সভার বিরুদ্ধে হইচই শুরু করে দেয় এবং বলে যে কোরান বা বাইবেল থেকে কিছু তারা আবৃত্তি করতে দেবে না। এই মর্মে তারা ইস্তাহার আর হ্যান্ডবিল বিলি করে। সেই সঙ্গে গান্ধিজিকে হিন্দুদের দুশমন আখ্যা দিয়ে তারা লোক ক্ষ্যাপাতে থাকে। একটি প্রচারপত্রে তারা এও বলে যে, গান্ধিজি তাঁর আচার-আচরণ না পাল্টালে তাঁকে খুন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গান্ধিজির অনশনে তারা আরও বেশি চটে লাল হয়েছিল। তারা ঠিক করল, আর নয়, এবার গান্ধিজি সম্পর্কে তারা একটা ব্যবস্থা নেবে। গান্ধিজি আবার প্রার্থনা সভা চালু করার ক'দিনের মধ্যেই তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়া হল। সৌভাগ্যক্রমে কেউ তাতে জখম হননি। কিন্তু সারা ভারতের মানুষ তাতে স্তম্ভিত হল, কেননা গান্ধিজির গায়ে কেউ হাত তুলবে এটা তারা কখনও ভাবতেই পারেনি। পুলিশ তদন্ত শুরু করল। এটা খুব আশ্চর্যের যে, কে বোমা রেখেছিল এবং সে কীভাবে বিড়লা ভবনের বাগানে ঢুকে যেতে পারল, এ সম্বন্ধে কোনও খবরই পুলিশ বের করতে পারেনি। এটাও খুব অদ্ভুত যে, এই ঘটনার পরেও গান্ধিজির প্রাণরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনমত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই একটি ঘটনায় বোঝা গিয়েছিল যে, সংখ্যায় যত কমই হোক, একটি বদ্ধপরিকর গোষ্ঠী আছে, যারা চেষ্টা করছে গান্ধিজিকে খুন করতে। এ থেকে স্বভাবতই আশা করা হয় যে, দিল্লির পুলিশ আর গোয়েন্দারা গান্ধিজির নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। এ আমাদের চিরকালের

লজ্জা, দুঃখ যে, আজ কবুল করতে হচ্ছে, একেবারে প্রাথমিকতম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও আমরা অপারগ হয়েছি।

আরও কয়েকটা দিন কাটল। গান্ধিজি যখন আস্তে আস্তে শরীরের হৃতবল ফিরে পেলেন, তখন আবার তিনি প্রার্থনান্তিক জমায়েতে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। হাজার হাজার লোক এই প্রার্থনা সভাগুলোতে যোগ দিত। গান্ধিজি মনে করতেন জনসাধারণের মনে তাঁর বাণী সঞ্চারিত করার দিক থেকে এই ধরনের সমাবেশ একটি অতি ফলপ্রসূ উপায়।

১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে আমি গান্ধিজির কাছে যাই। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা করার দরকার ছিল। এক ঘণ্টারও বেশিক্ষণ বসে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তারপর আমি বাড়ি ফিরে আসি। তারপর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়, যে কয়েকটা জরুরি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে আমার 'পরামর্শ নেওয়া হয়নি। আমি সোজা বিড়লা ভবনে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। সমস্ত গেট বন্ধ। হাজার হাজার লোক খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় পর্যন্ত ভিড় উপচে পড়েছে। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার গাড়ি দেখে লোকে রাস্তা ছেড়ে দিল। গেটের কাছে গাড়ি থেকে নেমে আমি তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়ির সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাড়ির একজন জানালার শার্সি দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল। ঢোকার মুখে একজন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'গান্ধিজিকে গুলি করেছে, এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।'

খবরটা এমনই শোচনীয় আর আচমকা যে, কথাগুলোর অর্থ আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় গান্ধিজির ঘরের দিকে হেঁটে চললাম। দেখলাম মেঝের ওপর তিনি সটান পড়ে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে আর চোখ দুটো বন্ধ। তাঁর দুই নাতি তাঁর পা দুটো ধরে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমি শুনলাম কেউ বলল, 'গান্ধিজি মারা গেছেন।' এই হত্যাকাণ্ডে দেশে সামগ্রিকভাবে শোকের জোয়ার বইলেও, মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে বন্দরে লোকে মিষ্টি বিলি করল আর আমোদ আহ্লাদ করল। বিশেষ করে, গোয়ালিয়র আর জয়পুর সম্পর্কে এটা বলা হল। যখন শুনলাম এই দুটি শহরেই প্রকাশ্যে মিঠাই বিলি করা হয়েছে এবং কিছু লোক সবার সামনে আহ্লাদে আটখানা হওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে, আমি একেবারে হতবাক হলাম। কিন্তু তাদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হল। শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সারা দেশ। লোকের রাগ গিয়ে পড়ল তাদেরই ওপর, যাদেরই তারা গান্ধিজির শত্রু বলে মনে করল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং ইউনিয়ন সরকারের মন্ত্রী। ভয়ে তিনি বাড়ির বার হতে পারলেন না এবং কিছুদিন পর মহাসভা থেকে ইস্তফা দিলেন। আস্তে আস্তে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হল এবং লোকজনেরা থিতু হয়ে বসল।

খুনি গডসের নামে আদালতে মামলা উঠল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাঁড় করাতে যথেষ্ট টালবাহানা হল। গান্ধিজিকে হত্যা করার পেছনে ষড়যন্ত্রের জাল এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, তার খোঁজখবর করতেই পুলিশের মাসের পর মাস লাগল। গডসের গ্রেফতারে লোকের প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল যে, হিন্দু সমাজের একটা অংশে সাম্প্রদায়িক বিষ কত গভীরভাবে চারিয়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় গডসের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেও এবং তাকে জুডাসের সমগোত্র বলে মনে করলেও, গণ্যমান্য পরিবারের কিছু মহিলা নিজের হাতে সোয়েটার বুনে গডসেকে পাঠিয়েছে। তার মুক্তি চেয়েও একটা আন্দোলন হয়েছিল। তার ভক্তরা খোলাখুলিভাবে তার কাজ সমর্থন করেনি। বলেছে, গান্ধিজি যেহেতু অহিংসার পূজারি ছিলেন, সেই জন্যে তাঁর হত্যাকারীদেরও ফাঁসি দেওয়া ঠিক নয়। জওহরলালের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলা হয় যে, গডসেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা হবে গান্ধিজির নীতিবিরুদ্ধ কাজ। অবশ্য আইনে যা হওয়ার তাই হল এবং হাইকোর্ট সেই দণ্ড বহাল রাখল।'

(মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিত 'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।)

গান্ধিজিকে হত্যা প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল

কংগ্রেস দলের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধি গত ২০১৪ সালের ৬ মার্চ মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দিতে এক জনসভায় বলেছেন,'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছিল। আর আজ তারা (বিজেপি) মহাত্মা গান্ধির কথা বলছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের নেতা ও মহাত্মা গান্ধির অনুগামী ছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে আর এস এস সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন, আর আজ বিজেপি কংগ্রেসকে বলছে যে সর্দার প্যাটেল তাদের নেতা।'

মহাত্মা গান্ধি ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নিহত হন। ওই সময় হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আর এস এস-এর স্বেচ্ছাসেবকরা হিন্দু মহাসভার মধ্যে থেকে কাজ করত। রাহুল গান্ধির উপরোক্ত বক্তব্যের পর আর এস এস-এর মুখপাত্র রাম মাধব বলেছেন যে তারা রাহুলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে

অভিযোগও করেছেন। বিজেপি দলের সভাপতি রাজনাথ সিংও বলেছেন, রাহুল গান্ধির ইতিহাস প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞান নেই। কংগ্রেস দল যদি এই মন্তব্য প্রত্যাহার না করে তাহলে বিজেপি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে রাম মাধব জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে গত মাসে অপর একটি বক্তৃতায় রাহুল বলেছিলেন, ক্ষ্ম বিজেপি দল যাকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছে তিনি আর এস এস-এর মতন একটি সংগঠনের ওপর বিশ্বাস রাখেন। যাদের বিষাক্ত মানসিকতার জন্য মহাত্মা গান্ধিকে নিহত হতে হয় ক্ষ্ম ওই বক্তব্যের পর অবশ্য আর এস এস বলেছিল, রাহুল গান্ধির প্রাক প্রাথমিক (কিন্ডার গার্ডেন) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা (অর্থাৎ আর এস এস) কোনও প্রতিক্রিয়া জানাবে না।

মহাত্মা গান্ধি নিহত হবার পর তৎকালীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর এস এস-কে বেআইনি ঘোষণা করেন। এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে ১৯৪৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি যে বার্তাটি প্রচার করা হয়েছিল সেটিতে বলা হয়েছিল।

....Government have– however– noticed with regret that in practice members of Rashtriya Swayamsewak Sangh have not adhered to their professed ideals.

Undesirable and even dangerous activities have been carried on by the members of the Sangh. It has been found that in several parts of the country individual members of the Rashtriya Swayamsewak Sangh have indulged in acts of violence involving arson– robbery– dacoity and murder and have collected illicit arms and ammunitions. They have been found circulating leaflets– exhorting people to reéôésort to terrorist methods– to collect firearms– to create disaffection against the government and suborn the police and military.

মহাত্মা গান্ধি নিহত হবার পর সারা দেশের মানুষ তীব্র শোকাহত হন। এই শোক ক্ষোভ ও ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। মানুষের এই ক্রোধের আঁচ পেয়ে হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাসভা থেকে ইস্তফা দেন। তখন তিনি ইউনিয়ন সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল অবহিত ছিলেন।

১৯২৫ সালে ড. কেশবচন্দ্র হেগড়েওয়ার ও আরও কয়েকজন মিলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তাঁর সংগঠন কোনদিনই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে একটি ধর্মীয় হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলে এই উদ্দেশ্য (হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) সফল হবে না। তাই তারা ছিল প্রবল কংগ্রেস বিরোধী। সংঘের সদস্যরা হিন্দু মহাসভার মধ্যে থেকে কাজ করত। মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ও তার সঙ্গীরা আর এস এস করত বলে অভিযোগ। ওঠে। সর্দার প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সংঘকে বেআইনি ঘোষণা করেন। সংঘের সরসংঘচালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকারসহ বহু কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। গোলওয়ালকার একটি চিঠিতে সর্দার প্যাটেলকে জানান যে নাথুরাম ও তার ভাইদের সঙ্গে আর এস এস-এর কোনও সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য ছিল, আর এস এস-এর তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের জন্য মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড সংগঠিত ও তাঁর অমূল্য জীবনের অবসান হয়। এরপর গোলওয়ালকার সর্দার প্যাটেলকে লেখা আরেকটি চিঠিতে আবেদন করেন যে কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য তিনি ও সংঘ সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে পারে। তাঁর এই প্রস্তাব সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল নিরুত্তর ছিলেন।

কিন্তু ১৯৪৯ সালে আর এস এস-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার আগে সর্দার প্যাটেল তাদের দিয়ে একটি মুচলেকা স্বাক্ষর করিয়ে নেন যাতে গোলওয়ালকার প্রতিশ্রুতি দেন আর এস এস একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনরূপেই কাজ করবে, কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে না। প্রসঙ্গ, উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯৪ সালের ২৮ জানুয়ারি 'ফ্রন্টলাইন' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে নাথুরাম গডসের ভাই গোপাল গডসে, যাঁর বিরুদ্ধেও মহাত্মা হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল তিনি বলেন, আর.এস.এস একটি কাপুরুষ সংগঠন। কেননা তারা ভাইরা কৈশোর থেকেই আর এস এস-এর সদস্য ছিলেন একথাটা স্বীকার করার সাহস সংঘ দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আর এস এস-এর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন।

১৯৪৮ সালে ১৮ জুলাই সর্দার প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেনঙ্খ

...Our reports do confirm that– as a result of the activities of these two bodies– particularlythe former Sthe RSSV– an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy SGandhijiós assassinationV became possible. There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in this conspiracy. The activities of the RSS constituted a clear threat to the

existence of government and the state. Our reports show that those activities– despite the ban– have not died down. Indeed– as time has marched on– the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing measure.

উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদিও মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তিনিই আবার ১৯৫১ সালে আর এস এস-এর সমর্থন নিয়ে ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেছিলেন, যা আজ বিজেপিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর এস এস-এর বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য কী এখন আর এস এস ও বিজেপি কি তার বিরুদ্ধে কোনও 'মরণোত্তর' ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ? (সমাপ্ত)

জরুরি অবস্থা ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

১৯৭৭ : নির্বাচন ঘোষণা

দেশ বিদেশের রাজনৈতিক মহল ও সংবাদ মাধ্যমকে বিস্মিত করে ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৭ সালের ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করেন বর্তমান লোকসভা (৫ম লোকসভা, ১৯৭১-১৯৭৭) বিলুপ্ত হবে ও মার্চ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর সামান্য কিছুদিন আগে ৫ নভেম্বর, ১৯৭৬-এ তিনি নির্বাচন আরও এক বছর স্থগিত রাখার (অর্থাৎ মার্চ, ১৯৭৮ পর্যন্ত) সিদ্ধান্ত সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। একথা জানা গিয়েছিল যে সঞ্জয় গান্ধি এই সময় নির্বাচন করার বিরুদ্ধে দিলেন। সঞ্জয়ের বিশ্বস্ত অনুচর ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৭ এ ঘোষণা করেছিলেন যে নির্বাচন খুব তাড়াতাড়ি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

নির্বাচন ঘোষণা সংক্রান্ত বক্তৃতায় ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন যে 'আমাদের দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার তার ক্ষমতা ও অধিকার জনসাধারণের কাছ থেকে অর্জন করে। এই বিশ্বাসের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণও তাদের সার্বভৌম মতপ্রকাশের অধিকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাধাহীনভাবে ও নির্ভয়ে প্রয়োগ করে এবং নিজেদের পছন্দ মতন নীতিসমূহ ও সরকারকে বেছে নেয়।' তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভার বিলুপ্তি ঘোষণা করে নতুন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার জন্য পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে প্রায় সব রাজনৈতিক বন্দিদেরই মুক্তি দেওয়া হয়। যদিও ১৯৭৫-এর ২৬ জুন জরুরি অবস্থার ঘোষণার ৬ মাস পরেই জেপিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান নেতাদের প্রায় সবাইকেই ১৯৭৬-এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই মুক্তি দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও তুলে নেওয়া হয়। রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়। যদিও জরুরি অবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়নি। কিন্তু ওই ব্যবস্থার মধ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করায় জরুরি অবস্থা নামেই বজায় থাকলো। আদি কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি, ভারতীয় লোকদল (স্বতন্ত্র পার্টিসহ) ও জনসংঘ প্রভৃতি দলগুলির নেতৃবৃন্দ ২০ জানুয়ারি জয়প্রকাশের উপস্থিতিতে দিল্লিতে সভা করে 'জনতা পার্টি' গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই সময়ে ঘটে যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুণা, ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী ও আরও কিছু কংগ্রেস নেতা ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে তারা কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি (সিএফডি) দল গঠন করছেন। এই সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রেসের কাছে একটি বিরাট আঘাত। বিরোধীরাও এর ফলে প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়। জনসাধারণের । মধ্যেও কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

জনতা পার্টি একটি অভিন্ন নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে মোরারজি দেশাইকে তাদের প্রধান নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে নির্বাচনে লড়বে বলে ঘোষণা করে। আসন সমঝোতার জন্য জনতা পার্টি ও সিএফডি'র মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই দলগুলি আবার সিপিআই (এম), আকালি দল ও ডিএমকের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে। - প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমস্ত বিরোধী দলগুলির - একটি ঐক্যবদ্ধ জোট এইভাবে গড়ে ওঠে - এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে এই বিরোধী জোটের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে এডিএমকে দলের তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী সমঝোতা হয়। এই সমঝোতার মধ্যে সিপিআই দলও ছিল। কেরলে আগে থেকেই সিপিআই কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার চলছিল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআই-এর নির্বাচনী

সমঝোতা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ বাদে সারা দেশে আর কোনও প্রদেশে সিপিআই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি।

১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যাপক বিপর্যয় হয়। জনতা পার্টি ও সিএফডি একত্রে, ৫৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন জয়লাভকরে। তারা সারা ভারতে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩.২ ভাগ ভোট পায়। কংগ্রেস সারা দেশে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৪.৫ ভাগ ভোট পায়। কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হয় ১৫৩। কংগ্রেসের জোটসঙ্গী এডিএমকে পায় ১৯টি আসন। সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়। ইন্দিরা গান্ধি ও সঞ্জয় গান্ধি তাঁদের নিজ নিজ কেন্দ্র যথা রায়বেরিলি ও আমেথি থেকে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। তবে কংগ্রেস দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট ভালো ফল করে। উত্তর ভারতে কংগ্রেস ২৩৪টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসনে জেতে। অপরদিকে পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে কংগ্রেস ৭৪টির মধ্যে ৩০টিতে জেতে। পশ্চিমে উত্তর ভারতের মতন অত খারাপ ফল হয়নি। দক্ষিণ ভারতে ১২২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১৯৭১ সালের ৭২ থেকে বেড়ে ১৯৭৭ সালে হয় ৯২টি। দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্য যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও কেরলের উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতন জরুরি অবস্থার সময় বাড়াবাড়ি হয়নি। ২০ দফা কর্মসূচি রূপায়ণের ওপর অপেক্ষাকৃত জোর দেওয়া হয়। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এর ফলে উপকৃত হয়। নির্বাচনী ফলাফলে তারই প্রতিফলন হয়।

১৯৭৭-এর নির্বাচন সিপিআই(এম) ও সিপিআই

১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে অবশেষে সিপিআই(এম) সমস্তরকম জড়তা পরিত্যাগ করে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী ঘেঁষা মধ্যপন্থী শক্তির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় হয় এবং দক্ষিণপন্থী শক্তি বিপুলভাবে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে।

নির্বাচনের উপরোক্ত ফলাফলে, সিপিআই(এম) স্বৈরতন্ত্রের ও আধা ফ্যাসিস্ট রাজত্বের অবসান হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে সিপিআই(এম) দল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আধা সামরিক সাম্প্রদায়িক শক্তির (পড়ুন আর এস এস) দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। যদিও সিপিআই(এম)-এর আনন্দিত হওয়ার কিছু ছিল না। কেননা, তাদের আসন সংখ্যা ১৯৭১-এর ২৪ থেকে কমে ২১-এ দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের ফলে দক্ষিণপন্থীদের শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় , কিন্তু বামপন্থীদের শক্তিও হ্রাস পায়। সিপিআই তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে ৭টি আসন পায়। অন্যান্য রাজ্যে এই দলের বিপর্যয় ঘটে। ১৯৭১-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের চমকপ্রদ সাফল্য (প্রাপ্ত আসন ৩৫২) হলেও দুই কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত আসন ছিল ৫০। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির ফলে কমিউনিস্টদের শক্তি হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭১-এ দুই কমিউনিস্ট পার্টির (এককভাবে লড়েও) প্রাপ্ত ভোট ছিল শতকরা ৯.৮৫ ভাগ। অথচ ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ সিপিএম-এর আসন কমলো। সিপিআই-এর আসনও ১৯৭৭-এর ২৫ থেকে কমে দাঁড়াল ৭-এ। আর দুই পার্টির প্রাপ্ত ভোট কমে দাঁড়াল ৭.১১ ভাগ। ১৯৭৭-এর দক্ষিণপন্থী শক্তির অগ্রগতি এবং মধ্যপন্থী ও বামপন্থী শক্তির অধোগতির এই হল সূত্রপাত। অপরদিকে আর এস এস সরকারি প্রশাসনের শীর্ষস্থানে সরাসরি আরোহণ করতে সক্ষম হল। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে, অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নির্বাচনী সমঝোতা বা জোট গঠনের রাজনীতি স্বীকৃত হয়। পরবর্তী প্রায় ১৫ বছর ধরে এই রণকৌশল অবলম্বন করে কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও সোশ্যালিস্টরা চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিভূ আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় জনতা পার্টিকে (ভারতীয় জনসঙ্ঘের নতুন রূপ) সম্মান প্রদান করে ও রাষ্ট্র ক্ষমতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় জ্জ অবশ্যই কংগ্রেসকে পরাস্ত করার নামে নিজেদের শক্তি হ্রাস করে। (ক্রমশঃ)